বাঙালির রেনেসাঁয় নজরুল

বাঙালির রেনেসাঁয় নজরুল

আল রুহী

বাঙালির রেনেসাঁয় নজরুল
আল রুহী
প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা-২০২৪
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ ও বর্ণ বিন্যাস : ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য : ২৫০ টাকা
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৮৯৮-৯-৮
ISBN : 978-984-96898-9-8

Bangalir Renesaye Nazrul
Al Ruhi, Published by Chayyanir.
Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900.
Date of Publication: Ekhushe Boimela -2024,
Copy Right: writer, Cover design: Chayanir Computer,
Book Setup: Chayanir Computer., Price: 250/- (Tow Hundered Fifty Taka Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/ ফোনে অর্ডার :
০১৬১১৯১৩২১৪

উৎসর্গ

আমার দাদাজান
মরহুম এম কেফায়েতুল্লাহ সরকার
ও
দাদিজান মরহুমা রাহাতুন্নেছা'র
উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬খ্রি.) এক যুগ প্রবর্তক কবি প্রতিভার নাম। তাঁর কালে এমনকি বর্তমানেও তাঁর কবিতা নিয়ে যতটা আলোচনা, গবেষণা হয়েছে বা হচ্ছে; তেমনি হয়েছে তাঁর বিরূপ সমালোচনা। সাহিত্যে সমালোচনা একটি স্বীকৃত বিষয়; কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণ কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। নজরুল ইসলাম ব্যক্তিগত আক্রমণের শিকার হয়েছেন বেশি। কখনো নাস্তিক, কখনো উন্মাদ, কখনো কাফের বলে গালিগালাজ করা হয়েছে। তিনি সকল তিরস্কার পুষ্পময় কণ্ঠে ধারণ করেছেন হাসি মুখে। হিন্দুদেবতা শিব যেমন জগতের সকল বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন, নজরুলও ঠিক তেমনি সকল অপমানের, গঞ্জনার বিষ আকণ্ঠে পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁর অসামান্য মহানুভবতাই তাকে মহত্ত্বের আসন দিয়েছে। কালের কণ্ঠ ধারণ করে তিনি হয়েছেন কালজয়ী। তাঁর একটি কবিতাই বাঙালির শাশ্বত চৈতন্যের বাতিঘর। বাঙালির সকল ক্রান্তিকাল আঁধার দুর্যোগের আলোর মশাল বাঙালির আজন্ম অস্তিত্বের শিকড় ঠিকানা। হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্যের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে তিতুমীর, ফকির মজনু শাহ, শমসের গাজী, মাস্টার দা সূর্য্য সেন প্রীতিলতার রক্ত ঝরা পথে এসেছে আজকের বাংলাদেশ। যেখানে কোন ভেদ বুদ্ধির স্থান নেই, উদার মানবিকতা আর স্বদেশপ্রেম, স্বদেশ বন্দনায় মুখরিত। সেই দেশ চেতনার আবহে, নজরুলের ভূমিকা- তার প্রাসঙ্গিকতা, তার অবদান নিরুপণ এ গ্রন্থের মৌল বক্তব্য। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে জুন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর পরাধীনতার যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল তা সমগ্র ভারতবর্ষে কালক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে হায়দারাবাদের নবাব শেরে মহিসুর টিপু সুলতানের রাজ্য বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশীয় বেইমান বিশ্বাস ঘাতকদের ষড়যন্ত্রের ফলে কেড়ে নেয়। আর তখনই বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোলুপ জিহ্বা আরো বাড়তে থাকে। এক সময় মোগল সর্বশেষ শাসক সম্রাট ফররুখশিয়ার রেখে দেওয়ানী চুক্তিতে বাধ্য করে ফেলে। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের জীবনে চরম দুর্যোগ দুর্ভাগ্য নেমে আসে অমানিশার কালো মেঘ হয়ে। তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনে বিপর্যয়ের মুখোমুখী হতে হয়। প্রায় দুইশত বছরের বৃটিশ শাসন ও শোষণে ভারতীয় মুসলিম সমাজ শোষিত ও বঞ্চিত হয়ে এক সর্বহারা জাতিতে পরিণত হয়েছিলো। ফলে মুসলিম জাতি একটি হীনমন্য জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তারা ভারতের বৃটিশ শাসকের সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে পরে পক্ষান্তরে ভিক্ষুকের জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে প্রথমে বাংলায়, পরে সমগ্র ভারতবর্ষেই রাজ্য, ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম সম্পদ হারিয়ে গোলামের জাতিতে রূপলাভ করে। বৃটিশ শাসকদের শত্রু ভেবে দূরে থাকার ফলে তারা একটি ইউরোপীয় ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবনবোধ থেকে বঞ্চিত হলেন; আর অন্য দিকে ভারতীয় হিন্দু সমাজ তা লুফে নিয়ে ইংরেজি ভাষা সাহিত্য ও জীবনবোধ গ্রহণ করে একদিকে বৃটিশ সরকারের সকল দপ্তরে চাকরি-বাকরি লাভ, ব্যবসার লাইসেন্স, পারমিট নিয়ে রাতারাতি ধনিক সেজে ধনিক সম্প্রদায়ের অধিপতি হয়ে গেলেন। তারা অঢেল কাচা টাকার মালিক হয়ে সামান্য কেরানী থেকে বাবু সম্প্রদায়ের জন্ম হতে লাগলো। এক সময় যারা মুসলমানের বাড়িতে/রাজ দরবারে খানসামা গোমস্তা/সেরানী নায়েবের চাকরি করতো, তারাই অগণিত অর্থ সম্পদের মালিক হয়ে তালুক জমিদারী কিনে রায় বাহাদুর খেতাবে ভূষিত হতে থাকেন। এভাবে একশত বছর বৃটিশ শাসন শোষণের পর বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হতে দেখা যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা তারই ধারাবাহিক ইতিহাস। অতঃপর নীল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ফকির মজনুশাহর বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ অন্যতম। লর্ড কর্নওয়ালিশের ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মনে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করে। কৃষকসহ সাধারণ প্রজার ভূমি স্বত্বের মালিকানা রহিত করে তা সামন্ত প্রভু জমিদারদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। যা তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে ভারতীয়দের মনে সেই ক্ষোভ থেকেই সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। উনিশ শতকের শুরুতে হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীন চন্দ্র সেন, রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখকগণ জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অজস্র কবিতা, গান লিখে ভারতবাসীকে ও জাগ্রত করার প্রয়াস পান। তবে তাদের সে ভারত শুধু হিন্দুর ভারতবর্ষ, সেখানে মুসলিম জাতির কোনো স্থান নেই। এভাবে হিন্দু লেখকগণ লেখনীর মধ্য দিয়ে যেমন সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটাতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়াতে দ্বিধা করেননি। তাদের কারণেই ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দেও ভারত বিভক্তির সময় দাঙ্গা বেধে যায়। এতে হাজার হাজার নিরীহ হিন্দু মুসলমান প্রাণ হারায়। যা সত্যি পরিতাপের বিষয়। অতঃপর বিশ শতকের শুরুতে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির মাঝে এক উদার ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চার আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। বাংলা ভাষার ইতিহাসে একে বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই আন্দোলনের সাথে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাদের অন্যতম কাজী আবদুল ওদুদ, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হোসেন, আব্দুল কাদির, সৈয়দ মোতাহার হোসেন চৌধুরী, রকিব উদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ মনীষী ও কাজী নজরুল ইসলামও এই আন্দোলনের অন্যতম অনুসারী। ফলে মুক্ত বুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অসংখ্য কবিতা গানে তাঁর মানস প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। নজরুল বাঙালির মানস বিপ্লব ঘটাতে যে তেজদীপ্ত ভাব ভাষা বাক্য ব্যবহার করেছেন তা বাংলা কবিতা ও গানে অন্য কোন বাঙালি কবি ইতোপূর্বে ব্যবহার করতে পারেননি। এক্ষেত্রে নজরুল বাংলা সাহিত্যের জাগরণ বা রেনেসাঁস

এনেছেন তা শুধু বাংলা কবিতা ও গানে নয়; বাঙালি জাতির সত্তা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাঙালির মানস বিপ্লব ঘটাতে মুক্ত বুদ্ধির চর্চায় বিশেষত কবিতা-গানে বাঙালির যে দ্রোহ চেতনা, যে শৃঙ্খল মোচনের প্রেরণা তা নজরুলের কাছ থেকেই পেয়েছে। বাঙালির এই যে মনোময় জগতে শাশ্বত চৈতন্য দানের প্রেরণা দাতা, বাঙালির যে রেনেসাঁস তাঁর উদগাতা কাজী নজরুল ইসলাম। সামন্তবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী ও সকল কুসংস্কারেও পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে বাঙালির নবজাগরণ কামনাই নজরুল সাহিত্যের মৌল প্রেরণা। সেই সাথে গণমানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় মুক্তি এবং তাঁর সাহিত্যকর্মের উপজীব্য বিষয়। শুধুমাত্র কিছু ধর্মনির্ভর ও ঐতিহ্য নির্ভর গান কবিতার জন্য তাঁর সার্বিক কবিতা গান মানব মুক্তির সাহিত্যকর্মকে অবমূল্যায়ন তাঁর প্রতি অবিচার ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথও অসংখ্য ধর্মীয় ঐতিহ্য নির্ভর কবিতা গান রচনা করেছেন। যাই হোক নজরুল সাহিত্যের নব মূল্যায়নে আমার এ গ্রন্থ 'বাঙালির রেনেসাঁয় নজরুল'। প্রিন্টজনিত কিছু শব্দের বানান ভুল রয়ে গেছে, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের আশা করি। নজরুল অনুরাগী পাঠক মহলে গ্রন্থটি সমাদৃত হলে কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনয়াবনত

আল রুহী

বিশ্বাস বেতকা, বিশ্বাস বাড়ি
টাঙ্গাইল-১৯০০
মোবাইল : ০১৭১২-৮৭১২৪৫

তারিখ : ০৭/০৮/২০২২খ্রি.

সূচীপত্র

১। বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলনের স্বরূপ
২। মধ্যযুগে ইউরোপের রেনেসাঁ
৩। নজরুল সাহিত্যে কালচেতনা
৪। নজরুল সাহিত্যে দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা চেতনা
৫। নজরুল সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িকতা
৬। বুদ্ধির মুক্তি ও বাঙালির রেনেসাঁয় কয়েকজন সারথি
৭। নজরুল সাহিত্যে আন্তর্জাতিকতাবাদ
৮। বাঙালি রেনেসাঁয় নজরুল সাহিত্য
৯। বাঙালির সামাজিক রেনেসাঁয় নজরুল
১০। বাঙালির রেনেসাঁয় নজরুল

বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলনের স্বরূপ

বুদ্ধির মুক্তি তথা চিন্তার মুক্তি বা স্বাধীনতা কথাটি সাধারণত মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা ভাবনা করার অধিকারের মাঝে নিহিত। মানুষ যা চান শিক্ষিত বিদ্যোৎজন ও চিন্তামনন ভাবনা দ্বারা তাড়িত হয়ে নতুন ভাবে গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে একটি বিষয়ের উপর সংস্কার সাধন, নতুন করে যাচাই বাছাই বিশ্লেষণ করে একটি কল্যাণকর পন্থা ও সত্য এবং ন্যায়ের পথে উদার মানবিক দৃষ্টি পোষণ করেন, তা গ্রহণের নিমিত্তে যে একটি ভাবাদর্শিক মনো পরিবর্তনের সূচনা করেন বা সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করেন তাই মূলত মুক্ত বুদ্ধির আন্দোলন। বস্তুত মুক্তবুদ্ধির চর্চা উজ্জীবনী প্রেরণার, নবজাগরণের ও সংস্কার সাধনের পথে সহায়তা দান করে। যদিও মুক্ত বুদ্ধি চর্চার জন্য চাই শিক্ষা, সত্যতা ও জ্ঞানভিত্তিক একটি জাতি। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারত্বই আমাদের তরুণ সমাজের শিক্ষা লাভের পর মুক্ত বুদ্ধি চর্চার প্রধান অন্তরায়। শুধু তাই নয়, নানাবিধ ধর্মীয় মতবাদ ও কুসংস্কার সর্বোপরি সামন্তবাদী বুর্জোয়া মনমানস আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এ কারণেও আমাদের মুক্ত বুদ্ধি চর্চার পথ অনেক সংকুচিত হয়েছে। মুক্ত বুদ্ধি চর্চার পথ প্রসারিত না হলে আমাদের সমাজ তথা রাষ্ট্রে কল্যাণবোধ, গোঁড়ামী ও অন্ধত্ব দূর হবে না। আর এ কারণেই আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রগতিবাদী ধ্যান ধারণায় বিকশিত রূপ দেখতে পাওয়া যায় না। আর মুক্তবুদ্ধির ক্ষেত্র তৈরী না হলে রেনেসাঁ বা পরিবর্তন পুনর্জীবন বা নবজাগরণ ঘটানো সম্ভব নয়। বুদ্ধির মুক্তি একটি সর্বজনীন ব্যাপার যদিও বিশেষ সময়ে পরিবেশে তা আন্দোলনে রূপ নেয়। কিন্তু, যেহেতু ইহা চিন্তার স্বাধীনতা তা কখনোই সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। সর্বজনীন এই মুক্তচিন্তার জাগরণ ঘটলেই কেবল মহৎ কল্যাণকর কিছু অভিপ্রায় জন্ম নিতে পারে। কারণ, জড়তা, ভুলবুদ্ধি যা মননচিন্তার অভাবে অন্ধত্ব, গোঁড়ামী ও পশ্চাৎপদতা অকল্যাণকেই আকড়ে থাকতে শেখায়। ভিন্নতর আরো কিছু কল্যাণকর সত্য থাকতে পারে সেই বোধ জন্মাতে দেয় না। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য শুধু বুদ্ধির মুক্তি এবং রেনেসাঁ বা উজ্জীবনী সঞ্জীবনীর প্রয়োজন রয়েছে।

বুদ্ধির মুক্তি কথাটির মধ্যে দেশ সমাজ সম্প্রদায় ও কালের সম্পর্ক নেই; এর অন্তর্নিহিত ভাব আবেদন সর্বজনীন, সর্বকালীন ও সর্ব মানবিক। বস্তুত বুদ্ধির মুক্তি সাধন ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চা প্রয়োগ প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তিরাও, সমষ্টিগত, সমাজগত দেশীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত। তবুও কোন একটি বিশেষণে মুক্ত বুদ্ধি চর্চার প্রাসঙ্গিকতা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। মুক্ত বুদ্ধির চর্চা সাধারণত শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মননচিন্তার অধিকারী লোকদের বিষয় এতে কোন সন্দেহ নেই। বুদ্ধির মুক্তি সাধন মূলত স্বাধীনভাবে চিন্তা করার মাধ্যমে একটি বিষয়ের ব্যাপারে মতামত প্রদানের অধিকার। যদিও বুদ্ধির মুক্তিই সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে না; তবে বাস্তব কষ্টকাছা নির্ধারণে সহায়তা করে। একটি সমস্যা সমাধানে বিচার বিশ্লেষণ যাচাই বাছাই অন্তে মুক্তভাবে চিন্তার মাধ্যমে একটি সমাধান বেরিয়ে আসে তবে সব সময় তাও আবার সম্ভব হয়ে উঠে না। সুতরাং সমস্যা সমাধান করতে হলে মুক্ত বুদ্ধি দিয়ে সমস্যার স্বরূপ অধিকার করতে হবে। আর সেই জন্য দরকার ঐতিহাসিকভাবে সামাজিক প্রেক্ষিত ও বাস্তব অবস্থার আলোকে সমস্যার সমাধান চিন্তা করা বা অনুসন্ধানের পথ অনুসরণ চিন্তাই মুক্ত বুদ্ধির চর্চা। তবে, একটি কথা জোর দিয়ে বলা যায় মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও লালন শুধু আন্দোলন নয়; ব্যক্তিকভাবে হয়ে আসছে যুগে যুগে। মানব সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসে মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও লালনের চিত্র একেবারে কম নয়। তবে, মুক্তবুদ্ধির চর্চার রূপ প্রকৃতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্নকালে বিভিন্ন দেশে একরকম নয়। এই মুক্ত বুদ্ধির চর্চা কখনো সামাজিক প্রেক্ষাপটে আবার কখনো ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে, আবার কখনো তা রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে ঘটতে দেখা গেছে। যার ভুরিভুরি প্রমাণ সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মতান্ত্রিক ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে। মুক্তবুদ্ধির চর্চা যুগে যুগে কালে কালে এর ধরণ, প্রেক্ষাপট বৈশিষ্ট্য সময় উপযোগী হয়ে থাকে। মুক্তবুদ্ধির চর্চার এক কথায় যুগের প্রয়োজনে সততা ও ধারণা পরিবর্তিত হতে দেখা যায়।

একজন মানুষ যখন গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে নতুনভাবে নতুন রূপে মুক্তভাবে চিন্তা করবেন, যে চিন্তা অন্য কারো মত নয়; অথচ তা সমাজ পরিবর্তন সাধনে বা সমাজের জাগরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে, মানব কল্যাণেও অবদান রাখবে তেমনি নতুন চিন্তার বিষয়কে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা বলা যেতে পারে। আর এই মুক্ত বুদ্ধির চর্চা করতে গিয়ে যুগে যুগে চিন্তাবিদ সমাজবিদ, বিজ্ঞানী, গবেষক, দার্শনিক আবির্ভূত হয়েছেন, নতুন চিন্তার কথা, তাদের মতামতের কথা বলতে গিয়ে নিগৃহিত হয়েছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন, এমনকি তাদের হত্যা করা হয়েছে। মহান দার্শনিক সক্রেটিসকে বিষ পানে হত্যা করা হয়েছিলো। যুগে যুগে প্রচলিত ধারণার অন্ধবিশ্বাস মানুষেরা ভাবতেই পারে না যে আজ যা সত্য ভাবছি কাল তা মিথ্যায় পরিণত হতে পারে, মানুষ যা জানতে পারে না, তা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। মানুষের এই বিচার বিশ্লেষণহীন মেনে নেয়াকেই অন্ধত্ব বলা যায়। একজন মানুষ যে নিয়ত সত্যের সন্ধান করবে, সে অন্ধভাবে সবকিছু মেনে নিতে পারে না।

বুদ্ধির মুক্তি ব্যাপারটি একটি আন্দোলন হিসাবে ধরে না নিয়েও ব্যক্তিগত পর্যায়ে বুদ্ধির মুক্তি সাধন ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চা যুগে যুগেই হয়েছে। মানব সভ্যতার সুপ্রাচীন ইতিহাসে মুক্ত বুদ্ধির চর্চার অবদান অপরিসীম। বুদ্ধির মুক্তি ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চা রূপ প্রকৃতি সর্বকালে সর্বযুগে ও সর্বদেশে এক ও অভিন্ন নয়। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ রয়েছে। মূলগত দিক থেকে রূপ প্রকৃতি একই হলেও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চিন্তা চেতনা ধ্যান ধারণা স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য বিদ্যমান। অন্তত মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে জ্ঞান চর্চা বুদ্ধি সাধনা, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের কর্ম প্রচেষ্টা নিরন্তর চলছে। জ্ঞান চর্চার সাথে অগ্রগতি সাধিত হতে পারে না।

মুক্ত চিন্তার ভাবনা স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নয়নে যারা অবদান রেখেছেন, মুক্ত চিন্তার জ্ঞান ও কর্মের সংযোগ সাধনের ফলেই তারা তা করতে পেরেছেন।

যুগে যুগে মহামনীষী, মহাপুরুষগণ জ্ঞানে বিজ্ঞানে, মুক্তবুদ্ধি চর্চার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ধর্ম প্রচারক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক যারা কবিতা ও সাহিত্যে মানব কল্যাণের কথা বলেছেন, মানব মুক্তির বার্তা বাহক তারা বুদ্ধির সাধনা ও জ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই তাদের চিন্তা ভাবনার কথা বলেছেন। বুদ্ধির চর্চা ও জ্ঞান সাধনা অজানাকে জানায়, অচেনাকে চেনায়, জীবন ও জগতকে রহস্যময়তা আবিষ্কারের মাধ্যমে ইহলৌকিক উন্নয়ন সাধনে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। এতে মানব কল্যাণ সাধিত হবে, এতে সমাজ আলোর পথে ধাবিত হবে, মানব সত্য ও মুক্তির পথ পাবে। মহাপুরুষ, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক সমাজবিজ্ঞানী যে সমাজ বা রাষ্ট্রেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন প্রথমে স্বসমাজ ও আপন সীমায় পরিবেশেই তাদের প্রধান দৃষ্টি থাকে।

স্বদেশ সমাজের মুক্তি, তাদের চিত্তের উত্থান ও মূল্যবোধের জাগরণই তাদের প্রথম লক্ষ্য। তবে বুদ্ধির মুক্তির সার্বিক ও সর্বজনীন আদর্শের কারণে তা স্বসমাজ ও স্বদেশ ছাড়িয়ে সর্বদেশে সর্বকালের মানুষের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠে। বুদ্ধির মুক্তির এই আদর্শ স্বসমাজে স্বজাতিতে কীভাবে সাড়া দিবে কতটা সাড়া দিবে তাঁর নির্ভর করে আন্দোলনকারীর, বাণী বাহকের, প্রবক্তার বক্তব্যের আবেদনের উপর, বাস্তবতাবোধ ও প্রয়োজনীয়তার উপর। রেনেসাঁর মর্মবাণী উপলব্ধি করতে হলে বুদ্ধির মুক্তির তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। যে কোন কল্যাণের জন্যই বুদ্ধির মুক্তির প্রাথমিক প্রয়োজন বা শর্ত। কারণ বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ যদি নিজের কল্যাণ অকল্যাণের পার্থক্য করতে না পারে, তবে তাঁর কল্যাণের সঠিক পথ ধরতে যে নিতান্তই ব্যর্থ হবে। আবার অনেক সময় আদর্শিক ব্যক্তিগণ বুদ্ধির মুক্তি ঘটাতে গিয়ে এক ধরণের আইডিয়া যার বন্ধন অলক্ষ্যেই থেকে যায়। বুদ্ধির মুক্তির বাণী বাহক বা মুক্তি বুদ্ধির অধিকারী বলে যারা নিজেদের ভাবতে থাকেন, অনেক সময় তারাও নিজের অজান্তে আইডিয়ার শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে যান। আর এ জন্যই গ্যাটে বলেছেন, "এভরি আইডিয়া ইজ এপ্রিজন" কথাটা গভীর অর্থবহ ও তাৎপর্যবহ। বুদ্ধির মুক্তির সাথে রেনেঁসার সম্পর্ক ও পার্থক্য কিছুটা আলোচনা করেছি। রেনেসাঁর সংজ্ঞায় এবং অন্তর্নিহিত অর্থ আবেদনের নিরিখে বিচার ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এমনকি রেনেসাঁর উৎপত্তি কবে কোন দেশে তা নিয়েও মত পার্থক্য রয়েছে। তবে রেনেসাঁর সংজ্ঞা ও অর্থের দিকে তাকানো যাক। রেনেসাঁর অর্থ পুনঃজন্ম এটি অবধারিত একটি অর্থ মাত্র। ব্যাপক ও গভীর অর্থে রেনেসাঁ অর্থ পুনর্জীবন ও পুরোনোকে ভিত্তি করে এর নির্মাণ বা নতুন সৃষ্টি বলা যায়। এদিক থেকে বলা হয়েছে "রেনেসাঁ অর্থ পুনর্জন্ম অর্থাৎ পুরাতনে ফিরে যাওয়া বা পুরাতনকে ফিরে পাওয়া।" কিন্তু "ভাবগত অর্থ নবজন্ম, মানে মানব মহিমা তথা বুদ্ধি ও কল্পনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। রেনেসাঁসের ইতিহাস তাই জীবন সূর্যের অরুণোদয়ের ইতিহাস, বুদ্ধি ও কল্পনার জয় যাত্রার ইতিহাস।" কাজেই এই সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে রেনেসাঁর মর্মবাণীর মধ্যে বুদ্ধির বিশেষ স্থান রয়েছে। বস্তুত জ্ঞান ও বুদ্ধির চর্চা ছাড়া নবজন্ম বা নবসৃষ্টি কোন ভাবেই সম্ভব নয়। রেনেসাঁ শুধু বুদ্ধিরই প্রাধান্য দেয় না, সাথে কল্পনারও স্থান রয়েছে। যে কারণে হৃদয় ধর্ম তাতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মানব মহিমার জন্ম স্থান যা তার প্রতিষ্ঠা বা নব উদ্বোধন করতে গেলে যেমন নতুন সৃষ্টি প্রয়োজন এবং বুঝতে গেলে মুক্ত চিন্তা ও হৃদয় বৃত্তি দিয়ে অনুভব করতে হয়। রেনেসাঁসের বিষয়টি মূলত ব্যক্তি কেন্দ্রিক এবং ব্যক্তি মনেই এর জন্ম। কিন্তু বুদ্ধির মুক্তি বিষয়টি পরবর্তীকালে আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। কিন্তু রেনেসাঁ বুদ্ধির মুক্তির মত অতটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়; প্রধানত সমষ্টি কেন্দ্রিক বলা যায়। রেনেসাঁর ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবদান একক হতে পারে কিন্তু সমষ্টিগত প্রচেষ্টার গুরুত্বই অপরিসীম।

মধ্যযুগে ইউরোপের রেনেসাঁ

রেনেসাঁর জন্ম হয়েছে মধ্য যুগে ইউরোপে, এই সময়সীমা ধরেই রেনেসাঁর তাৎপর্য বিচার বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। সকল সংস্কার মুক্ত হয়ে চিন্তা করার ব্যাপারই হচ্ছে রেনেসাঁ। জাতির চিন্তা রাজ্যে একটি বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধনের নামই রেনেসাঁ। অতীতে প্রত্যাবর্তনের নাম রেনেসাঁ নয়। আবার অতীতের সমূল বর্জনও রেনেসাঁ নয়। অতীতের ভালো স্থায়ী ভিত্তি নিঃসন্দেহে রেনেসাঁয় স্থান। অতীতের ভিত্তি ভূমির উপর দাঁড়িয়ে বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে রেনেসাঁর ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করে। মানুষের চিন্তা রাজ্যের এই বিপ্লবই রেনেসাঁ। রেনেসাঁ বিপ্লবের বাণী নিয়ে আসে অগ্রযাত্রার পদক্ষেপ করে বলে Revivalism ও Reformation প্রকৃতিগত পার্থক্য। অতীতের সকল বর্জন অথবা পুরানো সব কিছু ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া একটি বিপ্লবাত্মক ব্যাপার। তবে নতুন করে গড়তে নবনির্মাণের জন্য তা প্রশস্ত হবে। নজরুলের ভাষায়– "ভেঙ্গে যে জন গড়তে জানে, সেই চিরসুন্দর।" এক কথায় যদি নতুন করে নতুন সমাজ নির্মাণে বিপ্লবাত্মকভাবে রেভ্যুলুশান যা পুনর্জীবন আর রিফরমেশন বা সংস্কার পার্থক্য রেনেসাঁর সাথে এতটুকু অনুধাবনের সাথে বুদ্ধির মুক্তিও মুক্ত বুদ্ধি চর্চার বড় বেশি প্রয়োজন। মুক্ত বুদ্ধির চর্চার প্রচেষ্টা মানুষের প্রাচীন কালের। মধ্য যুগেই ইউরোপে সংঘটিত যে রেনেসাঁ তাই সাড়া পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তা ব্যক্তিভেদে ব্যক্তিরে মেধা মননে বিকশিত হতে থাকে। এই সংস্কার ধর্মীয় জাগরণে অনেক ক্ষেত্রে প্রেরণা যুগিয়েছে। যদিও রিফরমেশন প্রধানত ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে বুঝায়। তবে এর পরিবর্তন ব্যাপকহারে হলেই তাকে রেভ্যুলেশন বা বৈপ্লবাত্মক প্রক্রিয়াকে বোঝায়। তবে এই দুইয়ের মাঝে একটা সমন্বয় অনেকটাই লক্ষ্য করা যায়। তবে, রেনেসাঁর মূল লক্ষই হলো একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন, যা সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক ও বস্তু পরিবর্তনের দিকেই নির্দেশ করে। যেখানে সমাজ হবে বস্তুতান্ত্রিক ও মানবিক মুক্ত চিন্তার অভিসারী, কোন যুক্তিহীন বিষয় সমাজের নিয়ম নীতিকে কোন ভাবেই প্রভাবিত করবে না। চিন্তার মুক্ত পরিবেশ মানবিক সমাজের জন্য বড় বেশি প্রয়োজন। চিন্তাবিদগণ সেই পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন, যাতে সকল কূপমণ্ডূকতা মুক্ত মননশীল জাতি গঠনের পরিবেশ তৈরী হতে পারে। কিন্তু মানুষ নিজের অজান্তেই কোন না কোন ইজম বা মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। ফলে সে নিজের মধ্যে একটি দাম্ভিক সত্তার কবলে পতিত হয়ে সংস্কার মুক্ত মন দ্বারা মুক্ত চিন্তার পথে ধাবিত হতে পারে না। অথবা স্বসমাজ ও স্বজাতি তাকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে দেয় না। তবুও যুগে যুগে প্রতিটি দেশে মানুষের মধ্যে চিন্তাশীল মনীষীগণ মুক্ত চিন্তার চর্চা ও লালন করেছেন। রেনেসাঁর ইতিহাসে তারা আমাদের অগ্রগণ্য হয়ে আছেন। নিজেদের প্রয়োজনেই প্রতিটি জাতির রেনেসাঁ বা নবজাগরণের প্রয়োজন পড়ে। দেশ জাতি সমাজ বা রাষ্ট্রের যুগ সন্ধিক্ষণে বিশেষ প্রয়োজনে যে সময় অনুভূত হয় সমাজ বাস্তবতার আলোকে তা হুবহু অনুকরণ করলে ফল প্রত্যাশিত নাও হতে পারে। পনের শতকে ইউরোপে যে রেনেসাঁ শুরু হয়েছিল, তা তাদের ইউরোপীয়দের পতনের পর নিজেদের জাগরণের প্রয়োজনে রেনেসাঁর বিশ্লেষণ করে আবুল মনসুর আহমদ বলেন, "বাংলার মুসলমানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাগ্রত ও জীবন্ত করে তুলতে হলে, তাঁর জীবনে রেনেঁসা আনতে হলে, তার সাহিত্য সাধনাকে অনুকরণ অনুসরণ থেকে বাঁচাতে হবে। তাকে নিজস্ব সাহিত্য রূপ দিতে হবে, বাংলার বর্তমান সাহিত্যে মুসলমানের কোন দাম নেই বলে বাঙালি মুসলমানের কোন সাহিত্যই নেই, একথা ঠিক নয়; বস্তুত বাংলার মুসলমানের যেমন একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তেমনি তাদের একটি নিজস্ব সাহিত্যও আছে। সে সাহিত্য পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক রেনেসাঁ আসবে এই পুঁথি সাহিত্যের বুনিয়াদে। আমরা আবার পুঁথি সাহিত্যে ফিরে যাব, সে কথা আমি বলছি না। আমার মতলব এই যে, বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যের প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ভাষাও হবে মুসলমানের সুখের ভাষা। এই দুটিতেই আমরা পুঁথি সাহিত্যের প্রচুর প্রেরণা ও উপাদান পাব।"
(আবুল মনসুর আহমদ: রেনেসাঁ সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ : মাসিক মুহাম্মদী, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৫১ বাংলা)।

মুসলিম বাংলার সাহিত্য ধারাকে যারা পুরানওকরণের অন্ধ গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে নিজস্ব ইতিহাস ঐতিহ্য বোধ ও জীবন চেতনার ভিত্তিতে দাঁড় করাতে চেয়েছেন, কাজী আবদুল ওদুদ তাদের দলে ছিলেন না; বরং তিনি তাদের আত্মনিয়ন্ত্রী দল বলেছেন। আমাদের সাহিত্যকে পুঁথি ও লোক সাহিত্যের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে– এ রকম কোন ধারণাও তিনি ব্যক্ত করেননি। তিনি সাহিত্যে অতীত রোমগল্পের বদলে নতুনের আবহনের পক্ষপাতী ছিলেন। বর্তমানের আনন্দ বেদনা ও জীবনকে উপভোগের আকাঙ্ক্ষা, সাহিত্যে মানুষের সাধনা ও সৌন্দর্য প্রিয়তার মধ্য দিয়ে রূপায়িত হোক এটাই ছিল তার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এই নতুন জীবন চেতনা, জীবনকে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা যে লোক সাহিত্যের নতুন ভাষা ও আঙ্গিকে রূপ লাভ করে এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না। বিশ্ব সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ লেখকগণ সৃজনী রূপকারগণ এভাবেই নতুন ভাব ভাষা দিয়ে নতুন কালের সাহিত্য গড়ে তুলেছেন। প্রখ্যাত লেখক অন্নদাশংকর রায়ের ভাষায়:"রস নির্ঝরের দুটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে আসছে যুগের পর যুগ। একটির নাম সাহিত্য, অপরটি লোক সাহিত্য। ধারা দুটি কখনো ভিন্ন কখনো অভিন্ন, কখনো অবিচ্ছিন্ন। সাহিত্যের গৌরবময় যুগে দেখছি লোক সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক নিগূঢ়। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনি লোক সাহিত্যে রূপ শুরু, সাহিত্য রূপ শেষ। কানু বিনা গীত নেই, সেই কানুর গীত লোক সাহিত্য থেকে সাহিত্যে এসেছে। হোমারের ইলিয়াড, কালিদাসের শকুন্তলা, শেক্সপীয়ারের হেমলেট, গ্যাটের ফাউস্ট লোক সাহিত্য নির্ভর।"

কাজী আবদুল ওদুদ জার্মানির অষ্টবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখক গ্যাটের অনুরাগী ছিলেন। গ্যাটের সৌদর্য প্রীতি, সত্য ও স্বদেশপ্রীতি তাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কাজেই গ্যাটের ভিতর তিনি এক নবজাগরণ সূচিত মানসিকতার প্রত্যক্ষ

ফল অবলোকন করেছিলেন। মহা কবি গ্যাটে ছিলেন সত্য ও সুন্দরের সাধক। পরম সৌন্দর্য প্রেমিক গ্যাটের ভিতরে পরম আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেই কাজী আবদুল ওদুদ তার অকৃত্রিম অনুরাগী হয়ে উঠেন। মানুষের উর্বর চিত্তকে পল্লবিত করার ব্যাপারে গ্যাটে যেমন সত্য ও সৌন্দর্যের মোহন ছড়িয়েছেন; তেমনি মানুষের চিত্তে জ্ঞানশীলনের স্পৃহা জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই বলে গ্যাটে কল্পনার তুরীয়ানন্দে অবস্থান করেননি; বরং তিনি একান্তরূপেই বাস্তববাদী। তার মধ্যে কবি, কল্পনাপ্রেমিক ও কর্মযোগীর এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। গ্যাটে সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ বলেন, "জার্মানির অষ্টবিংশ শতাব্দীর এক শ্রেষ্ঠ প্রতীক গ্যাটে এবং Classicism এর প্রবর্তকের সন্ধানুকরা Renaissance এর কিন্তু তাদের সত্য ও স্বদেশানুরাগ অন্য কথায় কল্পনানুরাগ Reformation এর এই স্বদেশানুরাগ থেকেই গ্যাটে এমন একটি প্রাচীন উপকথা গ্রহণ করেন যা ইতোপূর্বেই তার স্বদেশবাসীর কল্পনা ও চিন্তার সাথে মিশে ছিলো। নতুন দার্শনিক তাৎপর্য (গ্যাটে প্রদত্ত) তাকে তাদের প্রকৃতি বোধ এবং কল্পনার কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে।"

পারস্পরিক প্রভাব ও মিলনের আন্তরিক আকুতি ও উল্লেখযোগ্য প্রয়াস সত্ত্বেও সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে হিন্দু মুসলিম এই দুইটি ধারা স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে এসেছে। এই স্বাতন্ত্র্যের পটভূমি রচনা করেছে ভিন্ন ঐতিহ্যবোধ জীবনাদর্শ ও জীবন চেতনা। এ সম্পর্কে ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন, "গত পাঁচ ছয় সাত শত বৎসরের মধ্যে বাঙালা ভাষাটা হিন্দু ও মুসলমানের উভয় মেরু হইয়া গিয়াছে। মুসলমানের ধর্মশাস্ত্র ও সামাজিক আদর্শ অনেকটা আরবী-ফারসী সাহিত্যে লিপিবদ্ধ, সেই সাহিত্যের জ্ঞান তাদের নিত্যকর্মের জন্য অপরিহার্য। আমাদের সেরূপ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ, আরবী ও ফারসীর সঙ্গে তাদেরও অনেকটা তাই। (ময়মনসিংহ গীতিকার ভূমিকা সুস্পষ্ট)।" বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা, দেশের ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস ও বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচয়িতারা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, দুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক বিধান সম্বন্ধে বিপরীত – হিন্দুরা বাংলার অনুপ্রেরণা পায় সংস্কৃত ভাষা হইতে, মুসলমানরা পায় আরবী-ফারসী হইতে। (বাংলাদেশের ইতিহাস-মধ্যযুগ রমেশ চন্দ্র মজুমদার পৃ. ২৪২-৪৩-৩৩-৫০)। হিন্দু-মুসলিম মিলনে বিশ্বাসী, তাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে একনিষ্ঠ প্রাণ মিলিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা কাজী নজরুল ইসলাম মনে করতেন, বিশ্ব কাব্য লক্ষ্মীর অর্ধেক অলংকারই মুসলমানী। তার ভাষায়, 'আমি মনে করি, বিশ্ব কাব্য লক্ষ্মীর একটা মুসলমানী ঢং আছে। ও কাজে তার শ্রীহানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও ঢং এর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। বাংলা কাব্য লক্ষ্মীকে দুটো ইরানী জেন্তর পরালে তার জাত যায় না। বরং তাকে আরও খুবসুরতই দেখায়। আজকের কাব্য লক্ষ্মীর অর্ধেক অলংকারইতো মুসলমানী ঢং এর। বাইরের এ কর্মের প্রয়োজন ও সৌন্দর্য্য সৌকমার্য সফল শিল্পী স্বীকার করেন। পণ্ডিত মালাবিয়া স্বীকার করতে না পারেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন।' (বড়র পীরিতি বালির বাঁধ: নজরুল রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা-৬২৭)। সাহিত্য-শিল্পকলায়ও এই মুক্ত বুদ্ধি চর্চা ও রেনেসাঁর প্রয়োজন রয়েছে, সে সম্পর্কে নজরুলের এই অভিমত আমরা মনে করি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও সমার্থ। বুদ্ধিবৃত্তিক কায়দায় জ্ঞানানুশীলন যেমন জরুরী; তেমনি সাহিত্য শিল্পের সৃজন বিকাশ অতীব জরুরী। আর তা বাংলা সাহিত্যে নজরুলের মত করে কেউ করতে পারেননি বলেই তিনি এত আলোচিত সমালোচিত হয়েছেন। কাজেই বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলনে যেমন তার ভূমিকা; তেমনি তার বাস্তবায়নে সৃজন কর্ম দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্য ও বাঙালিকে চির ঋণগ্রস্ত করে গেছেন। বাঙালি জাতি, বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যে তার অবদান অবিনশ্বর হয়ে আছে আমাদের মাঝে।

বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলিম দুই ধারার পার্থক্য স্পষ্টতর; কেউ স্বীকার করুক বা নাই করুক। কাজী আবদুল ওদুদ সাহিত্যের উপজীব্য রূপ রঙের এমন স্বাতন্ত্র্যের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন,"আরো একটি ব্যাপার চোখে পড়েছে বঙ্গ সাহিত্য হিন্দু ও মুসলিম এই দুই ধারায় সম্মিলিত হয়েই রয়েছে; কিন্তু গঙ্গা-যমুনা ধারার মত। ভবিষ্যতেও দুইয়ের এই অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে কিনা, সেটি হয়তো নির্ভর করবে তাদের পরস্পর সামাজিক সম্বন্ধের উপর।" কাজী আবদুল ওদুদ বীজবস্তু জাগতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইতে পারে এই আশাবাদ ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "উৎকট ব্যক্তিবাদ এবং কর্মে অবিশ্বাস নিপুণ বক্ষের সাধনায় অন্তর্গত। হিন্দু সাধনার কথাও তাই। হিন্দুর নিপুণ ব্রক্ষবাদের সাধনা ও জাতি অভিমান বীজবস্তু জাগতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হইতে পারে। অন্য পক্ষে মুসলমানের সাহিত্য সাধনার ভিতর দিয়া বীজবস্তু জাগতিক আদর্শ তথা বিশ্ব জ্ঞান ও বিশ্ব সৌন্দর্যবোধ রূপায়িত হবার সম্ভাবনা এই কারণে যে, মুসলমানের ধর্মাদর্শ যে আল্লাহর পরিকল্পনা আছে, তিনি নানা সদগুণের আঁধার, সেই সদগুণের আল্লাহকে স্মরণ করে দৈনন্দিন জীবন সুন্দর ভাবে যাপন করবার এই যে, মুসলমানের প্রাচীন শিক্ষা তাঁর এ কালের শিক্ষা জীবনের বিশেষ প্রয়োজন, সেই শিক্ষার সাহায্যে তার লাভ হবে স্বাভাবিক।" (সমাজ ও সাহিত্য) সাহিত্য শিল্প যে শুধু রস দায়ী বা নিছক বিনোদনের মাধ্যম নয়; জীবনের নানা সমস্যা-প্রয়োজনীয়তায় সাহিত্যের ভূমিকা রয়েছে। জীবনের সাহিত্য শিল্পের ভূমিকার কথা, সমাজ বাস্তবতার আলোকে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা, যুগসন্ধিক্ষণে, কাল প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষ করে বাংলার মুসলমানের ঐতিহাসিক সংকটে, সমস্যা নিরসনে সাহিত্য সৃজনের ভূমিকায় প্রেরণা দান করেছিল। সে সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন, "এই সমস্যা সাহিত্যের কথা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি কতকগুলো কথা ভেবে। বাংলার মুসলমান এক নতুন জীবনের স্পন্দন অনুভব করতে শুরু করেছে। সেই নতুন জীবনের সূচনায় নানা সমস্যা সহজেই তাকে আঘাত দিচ্ছে। সেই সব সমস্যা যদি গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে রূপকে কিংবা নিবন্ধে সেরূপ দিতে চেষ্টা করে, তবে বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব

সম্পদ সেখানে করতে পারবে বলে আশা করা যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় বড় বড় উত্তেজনার মুখে উৎক্ষিপ্ত হয় বড় বড় সাহিত্য।" (সমাজ ও সাহিত্য)।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত, 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও এই সমাজের মুখপত্র শিখা পত্রিকা। শিখা গোষ্ঠীর লেখকগণ বাঙালির মুসলমান সমাজের নতুন জীবনের স্পন্দন অনুভবের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান তা আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। বর্তমান যুগ আপন পরিবেষ্টন সম্পর্কে সচেতন হয়ে অতীত দিনের মোহ মুক্তি ঘটিয়ে নতুন জীবন চেতনা, উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলায় দিক নির্দেশনা দেওয়াই তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর এই পট ভূমিকায় রচিত হয় অধ্যাপক আবুল হোসেনের বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা, বাংলার নদী সমস্যা প্রভৃতি গ্রন্থ। বাংলার মুসলমানের নানাবিধ অবক্ষয় দৃষ্টে কাজী আবদুল ওদুদ ও অধ্যাপক আবুল হোসেন বিশেষভাবে পীড়িত হয়েছিলেন। মুসলমানদের এই শুধু পারলৌকিক কল্যাণ চিন্তা, বস্তুতান্ত্রিক অস্বীকার তাদের পতনের ও মৌলিক কারণ বলে তিনি মনে করেন। অধ্যাপক আবুল হোসেন বলেছেন, "ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস ইহাই প্রত্যেক ধর্মের মূলতত্ত্ব। কিন্তু এই বিশ্বাস শুধু সুখে দুঃখে থাকিলে চলিবে না। অন্তরের বিশ্বাসই প্রকৃত জিনিস। ধর্ম প্রবর্তকগণ যে অনুশাসন দেন তাদের জাতির হিতই ধর্মের উদ্দেশ্য, এজন্য যুগে যুগে পৃথিবীর নব নব প্রয়োজন যা সমস্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রত্যেক ধর্মেরই কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়া থাকে এবং হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মুসলমানরা যেভাবে ইসলামকে আকড়িয়া ধরিয়া আছে, তাহাতে যথেষ্ট অন্ধ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেলেও জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় মোটেই পাওয়া যায় না। এ জন্যই দেখা যায় মুসলমানরা ধর্মের অনুষ্ঠান যথেষ্ট পালন করিতেছে; কই তাহারা তো সমাজ জগতে কর্মক্ষেত্রে বা জ্ঞান জগতে কোথাও উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে সকল প্রকার অপকর্মই অসংকোচে করিয়া যাইতেছে। ইহাতেই বোঝা যায় তাহাদের ঈশ্বরে ও পরলোকে প্রকৃত বিশ্বাস নাই। মুসলমানকে বুঝিতে হইবে যে, ইসলামের সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের জন্য, কেবল বিধি নিষেধ হুবহু পালন করিবার জন্য মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। যদি দেখা যায় যে, ইসলামের কোন বিধি মানব সমাজের কোন উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তবে নির্ভীকভাবে তাহা ত্যাগ করিয়া তদস্থলে নতুন বিধি গড়িতে হইবে, পুরাতনের মোহে হাবুডুবু খাইলে আর কল্যাণ নাই।" (সাহিত্য সমাজের ২য় বর্ষের প্রথম অধিবেশন ১৯২৮ অধ্যাপক আবুল হোসেনের নিবন্ধ পঠিত হয়)।

নজরুল সাহিত্যে কাল চেতনা

নজরুলের সাহিত্যে কাল চেতনা বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেঁসা আন্দোলনের দুই পুরোধা ব্যক্তিত্ব কাজী আবদুল ওদুদ ও অধ্যাপক আবুল হোসেন অধপতিত মুসলিম সমাজের জাগরণের জন্য, তাদের জ্ঞান ও চিন্তা জগতে প্রাণ সঞ্চারের আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। উপমহাদেশে তথা বাঙলার মুসলমানের চিত্ত জাগরণ বা নব জাগরণ ঘটাতে রবীন্দ্রনাথ ও রাম মোহনের আদর্শিক সমাজে বিতর্কিত হয়েছিলেন। তাদের প্রদর্শিত পথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন ধূমকেতুর মত কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) আরো জ্বালাময়ী, বিতর্কিত বক্তব্য ও সাহিত্য কর্ম নিয়ে। তা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামন্ততান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ উচ্চারণ ও বৈপ্লবিক কায়দায় গেয়ে উঠলেন তিনি জাগরণের অমোঘ বাণী: "আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু এই স্রষ্টার শনি মহাকাল, ধূমকেতু।" (ধূমকেতু-অগ্নিবীণা)।

বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও বাঙালির সমাজ জীবনে, তাঁর আগমন এক রেনেসাঁসের জন্ম দিয়েছে। বাঙালির সকল ক্ষেত্রেই তিনি রেনেসাঁসের জয়ভেরী বাজিয়েছেন। যা কিছু পুরাতন, যা কিছু পশ্চাৎপদ, অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন যা কিছু নতুনকে বরণ করতে ভয় পায়, যা কিছু মিথ্যা ভন্ডামী তাকে তিনি সমাজ ও মানব মন থেকে উপড়ে ফেলতে বলেছেন। যে সনাতন ধ্যান ধারণা আমাদের সামনে চলতে বাঁধা প্রদান করবে, তাকে দু পায়ে মাড়িয়ে যেতে হবে। নজরুলের কাব্য সাহিত্যকে তাই মানব জাগরণের মুক্তির সোপান হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সাহিত্য কাব্য সৃষ্টিতে তিনি যে রোমান্টিক স্বপ্নময়তা বিভোর ছিলেন: কিন্তু তাঁর সে স্বপ্নময়তা ধ্যান সহজেই ভেঙ্গে যায়। চিরন্তন মানব আত্মার অব্যক্ত দুঃখ বেদনা, তাদের অমর্যাদা অপমান তিনি সইতে পারেননি। তাই তাদের ব্যথায় ব্যথিত হয়েছেন, তাদের মুক্তি মর্যাদা তার সাহিত্য কবিতার মৌলসুর। এই মানব মুক্তি ও তাঁদের সমতা ভিত্তিক মর্যাদা তার কাল চেতনার অন্যতম স্বরূপ। যা আলোচনার দাবী রাখে। বাংলা সাহিত্যে নজরুল চেতনার কথা বলার পূর্বে একটি কথা মাথায় রাখতে হবে যে, বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট পরাধীন ছিল। সামন্তবাদী সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেখানে মানুষ বিশেষত অশিক্ষিত দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী গণমানুষ প্রতি মুহূর্তে শোষণ বঞ্চনা ও নানা প্রকার নির্যাতনের শিকার হতেন। এই নির্যাতন সামাজিকভাবে সমাজপতি, রাজনৈতিকভাবে শাসনতান্ত্রিকভাবে, ধর্মের নামে যত অন্ধত্ব গোঁড়ামী, কূপমণ্ডূকর্তা, আচার নীতি প্রথার নামে অসহায় দরিদ্র মানুষগুলোকে নানাভাবে ফাঁদে ফেলে নিঃস্ব রিক্ত করা হতো। বলা যায় অসহায় মানুষগুলোকে রিক্ত নিঃস্ব সর্বহারা করা হয়েছিল। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের নামে শোষণ, অন্যদিকে তাদের এদেশীয় দোসর দালাল মুৎসুদ্দী সামন্তপ্রভু, সুদখোর মহাজন পুঁজিপতিগণ শাঁখের করাতের মত গণমানুষের চামড়া ছাঁড়িয়ে নেয়ার অবস্থা করেছিল। মানুষের জীবন ধারণ যেন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা।

প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ গণমানুষকে চঞ্চল করে তোলে। যুদ্ধের সময়ে ভারতে বৃটিশ সরকার ডিফেন্স আর ইন্ডিয়া এ্যাক্ট চালু করে হাজার হাজার ভারতীয়দের বিনা বিচারে আটক রেখেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অবশ্য যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এসেছে, যুদ্ধ শেষে দিল্লীতে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস অধিবেশনে যুদ্ধ জয়ের জন্য বৃটিশ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব গৃহিত হয়। কিন্তু সুচতুর বৃটিশ সরকার পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন যুদ্ধের পর ভারতে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন সংগ্রাম তীব্রতর হবে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাওলাট কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে দমন পীড়নমূলক একটি আইন চালু করা হয়। প্রতিবাদে দেশব্যাপি ৩০ মার্চ হরতাল, দিল্লীতে বিক্ষোভ মিছিলে বৃটিশ সরকারের পুলিশ বাহিনী গুলি চালায়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ১৩ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের দিনে অমৃতস্বরে প্রাচীর ঘেরা জালিয়ানওয়াল বাগে সমবেত হাজার হাজার মানুষের উপর বৃটিশ সামরিক বাহিনীর জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে সামরিক বাহিনী ১৬ শত রাউন্ড গুলি বর্ষণ করলে শত শত ব্যক্তি নিহত ও হাজার হাজার ব্যক্তি আহত হয়। পাঞ্জাবে বৃটিশ সরকার সামরিক আইন জারি করে। এই নৃশংস ও ভয়াবহ বীভৎস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাইট উপাধি ত্যাগ করে বড়লাট চেমসফোর্ডের কাছে প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন। এ সময়ে ভারতীয় মুসলমান সমাজে জামাল উদ্দিন আফগানির প্যান ইসলামিজম আন্দোলনের সাড়া পড়ে যায়। বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লববাদে ভারতীয় হিন্দু সমাজের মত মুসলমানগণ সমান তালে সাড়া দিতে থাকেন। ভারতীয় মুসলমান সমাজে জাগরণের দুইটি দিক একটি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অপরটি মুসলিম বিশ্বের সাথে গভীর একাত্মা বোধ। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাতে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের যৌথ অধিবেশন হয়েছিল; অথচ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সাম্প্রদায়িক আদায় এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে প্রকাশিত মনটেন্ড নেসনফোর্ড শাসন সংস্কার রিপোর্টে মুসলমান সমাজের দাবী দাওয়া স্বীকৃত না হওয়াতে মুসলমান সমাজের বৃটিশ বিরোধী তীব্র প্রতিক্রিয়া অসন্তোষ দেখা দেয়।" এরই প্রেক্ষিতে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ও ভূমিকা বাংলা সাহিত্যে বিশেষ তাৎপর্য বয়ে এনেছে।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) এর ধ্বংসলীলা ভারতীয় সমাজ জীবনে যেমন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে; তেমনি নজরুলের চিত্তেও প্রবল উত্তেজনা এনে দিয়েছিলো। ইউরোপে যখন যুদ্ধ চলছে তখন বাংলা সাহিত্যের একচ্ছত্র নায়ক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সময়ে ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে চলছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিষময় পরিণতি। সামাজিক শান্তি স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে থাকলে এমন কি ধর্মীয় অনুশাসনও হলো অবজ্ঞাত অস্বীকৃত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা নিয়ে প্রমথ চৌধুরী তার 'সবুজ পত্রে' নিয়মিত আলোচনা লিখলেন নাম

ছিলো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এই কালপ্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যে এলেন কালের সারথি কাজী নজরুল ইসলাম বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে। যুদ্ধের উত্তেজনাকে তিনি অনুভব করেন ভীষণভাবে। স্বপ্ন দেখেন রেনেসাঁসের বা নবজারণের। নবযুগ প্রবন্ধে তিনি তাই লিখলেন:"আজ মহা বিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহা আনন্দের দিন আজ মহা মানবতার মহাযুগের উদ্বোধন। ... ঐ শোন, শৃঙ্খলিত, নিপীড়িত বন্দীর শৃঙ্খলের ঝংকার। তাহারা কাবাগৃহ ভাঙ্গিবে। ঐ শোন মুক্তি পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি বিধান।... অন্ধ রক্ত প্রবাহে দাঁড়াইয়া মানব নব প্রভাতী ধরিয়াছে পোহালো পোহালো বিভাবরী, পূর্ব তোরণে শুনি বাঁশরী। এ সুর নবযুগের। সেই সর্বনাশা বাঁশীর সুর মিশর শুনিয়াছে, আয়ারল্যান্ড শুনিয়াছে, আরো অনেকে শুনিয়াছে এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্তান- জর্জরিত, নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ।" (নবযুগ- সাপ্তাহিক নবযুগ)।

নজরুল প্রথম জীবনে সৈনিক, পরে সাংবাদিক-রাজনীতিক। একাধারে তিনি কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক, শিশু সাহিত্যিক, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, রাগ স্রষ্টা, সংগীত পরিচালক, শিল্পী। শিল্পী বললে কম বলা হবে আসলে জীবনশিল্পী শিল্পের কাঁচামাল মশলা সংগ্রহ করেছেন জীবন ও জগত সংসার থেকে। সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ তিনি দেখেছেন, অনুভব করেছেন, জীবনের সাথে একাত্ম করে রং রূপ মিশিয়ে গড়ে তুলেছেন শিল্পের মিনার। আর তা প্রকাশ করেছেন মানবতাবাদী মহৎ দৃষ্টি নিয়ে বিদ্রোহী কণ্ঠে। নজরুলের সকল সাহিত্য কর্মেই সমকালের আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক বিভিন্ন বিষয় সচেতনভাবে উঠে এসেছে বলিষ্ঠ কণ্ঠে।

ধূমকেতু ও পরবর্তীকালে নবযুগ পত্রিকা বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে নজরুলের সমাজ ও কাল চেতনার সচিত্র পরিচয় প্রকাশিত হতে থাকে। সমসাময়িক কালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনাবলী নজরুলের সাহিত্য কর্মে সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব, তুরস্কের নব্য তুর্কীর উত্থান, আইরিশ বিপ্লব প্রভৃতি সংগ্রামে গণমানুষের অধিকার আদায়ের অভিন্ন বিষয়কে নিজের মধ্যে একাত্মতা অনুভব করে সে বিষয়ে গণচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে সাংবাদিকতায় যোগদান করেন। আর সে বিষয়গুলো তার কাব্য সাহিত্যে নানাভাবে চিত্রিত হতে দেখা যায়। নজরুল তাঁর সৈনিক জীবনে যুদ্ধের প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ, যুদ্ধের অনিবার্যতাকে চিন্তা চেতনা দিয়ে অনুভব করেছেন। এ সময়ে আয়ারল্যান্ড এর আন্দোলন (১৯০৫) গণ উত্থান, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার সমাজ বিপ্লব, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে তুর্কী বিপ্লব, মিশরে জগলুল পাশা, আনোয়ার পাশা, মরক্কোর গাজী আব্দুল করিমের নেতৃত্বে মুসলিম বিশ্বের অভূতপূর্ব গণজাগরণ তাঁকে চিত্ত চাঞ্চল্যের পথে ধাবিত করেছে। আর তা নজরুল কাব্য সাহিত্য কর্মের উপাদানে বিষয় করে কাল চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। এখানে তার সমকালীন সমাজ ভাবনা ও কালচেতনা সচেতনভাবেই উঠে এসেছে। তাঁর সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন বিষয়ে সমাজের মানুষ, তাদের দুঃখ দারিদ্র্য, অব্যক্ত বেদনার, তাদের পরাধীনতা অত্যাচার অবিচার শোষণ বঞ্চনা কিছু বাদ যায়নি। জীবন ও জগৎ সংসার থেকে তিনি সাহিত্য শিল্পের নিয়ামক শক্তি গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি জীবন শিল্পী হতে পেরেছেন। সমকালীন রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক সাহিত্য, সাংস্কৃতিক এমনকি ধর্মীয় বিষয় নিয়ে ঘটনা প্রবাহের প্রতিফলন ঘটছে নজরুল সাহিত্যে। নজরুল সমকালীন বিভিন্ন বিষয়কে বাস্তবতাবোধ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ, তাদের অভাব অভিযোগ সমস্যা, তাদের সাথে মিশে তাদের একজন হয়ে তিনি সেগুলোকে নির্মাণ, সাহিত্যে সেসব রূপায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। সাহিত্য যে শুধু নন্দন কলার বিষয় নয়; সমাজ সমস্যা সমাধানে, বিভিন্ন শ্রেণি চরিত্র গণমানুষের চাহিদা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ক্ষোভ বিক্ষোভের চিত্র, প্রতিবাদ সংগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহ করতেও দ্বিধা করেননি। তাই সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অসঙ্গতি দূর করতে তিনি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বিদ্রোহ করতে ছাড়েননি। নজরুল সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা হিন্দু-মুসলিম বিরোধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সামাজিক অসঙ্গতি, দুর্ভিক্ষ, ধনবাদ, অর্থনৈতিক সমস্যা, মুসলিম সমাজে কুসংস্কার, ধর্মের নামে অন্ধত্ব, গোঁড়ামী, মুসলিম সমাজের চিন্তার দীনতা স্থান পেয়েছে। নজরুল সাহিত্যের কার চেতনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জুড়ে রয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক, সামন্তবাদী প্রথার ভয়ানক রূপ, ভাঙ্গাগড়ার রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ফলে ভারতবর্ষের নানা রূপের অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষ্যম্যের ফলে শ্রেণি সমস্যার উদ্ভব ঘটে। সমকালীন পটভূমিতে অন্য কবি সাহিত্যিকগণও তাদের রচনায় সামাজিক কুপ্রথা পণ প্রথা নিয়ে এক মর্মান্তিক চিত্র এঁকেছেন। পণের নামে নারীর সামাজিক অবিচারকে রবীন্দ্রনাথ এড়িয়ে যেতে পারেননি। তার 'অবিচার' কবিতায় তিনি বলেছেন,

"নারীর দুঃখের দশা অপমানে জড়ানো
এই দেখি দিকে দিকে ঘরে ঘরে ছড়ানো
অর্ধেক কাপুরুষ অর্ধেক রমনী।
তাতেই তো নাড়ী ছাড়া এ দেশের ধমনী।
বুঝিতে পারে না ওরা, এ বিধানে ক্ষতি কার
জানিনা কি বিপ্লবে, হবে এর প্রতিকার।
এত কথা বৃথা বলি, যে পেয়েছে ক্ষমতা
নিঃসহায়ের প্রীতি নাই তার মমতা
আপনার পৌরুষ করি দিয়া লাঞ্ছিত
অবিচার করাটাই তার বাঞ্ছিত।"

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অত্যন্ত সচেতনভাবে তার কবিতায় সমকালের সামাজিক সংকট ও অসঙ্গতিগুলোকে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। পণপ্রথার শিকার নারী

কুলের প্রতি লাঞ্ছনা- অপমানের চিত্র, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার করুণ আকুতি, নারী হয়ে জন্ম নেয়া যেন আজন্ম পাপ, তারই চিত্ররূপ দেখতে পাওয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "মৃত্যু সমন্বয় কবিতায়"।

১. চাই শ্বশুরের সোনার কাঠি সুপ্ত জন্য চিয়া,
চাই মানুষের বুকের বধিয়। জাঁকের ছাফাজীয়াতে।
২. সতীদাহ গেছে কন্যাদায় থামবে কি?
রোগের ঋণের শেষ রাখেনা, কলঙ্কের শেষ রাখবে কি।"

উপরোক্ত কবিতার লাইন দুটিতে কন্যাদায়গ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থার করুণ অথচ মর্মান্তিক চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথ এই সামাজিক অবিচারকে, নারীর অপমানে পুরুষ ঘৃণা করেছেন। আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সামাজিক সমস্যাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তার চিত্র কবিতায় প্রকাশ করেছেন মাত্র।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দুইজন সমকালের সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সংকট প্রত্যক্ষ করেছেন সাহিত্যকর্মে তা তুলেও ধরেছেন; কিন্তু তাঁর প্রকাশরীতি শুধু বর্ণনা মাত্র, তা ক্ষোভে বিক্ষোভে উত্তাল হয়নি বিদ্রোহের বিষবাষ্পে জ্বালাময় প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেনি। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র কাজী নজরুল ইসলাম সম্পন্ন ভিন্ন মাত্রায়, ভিন্ন আঙ্গিকে সমকালীন ঘটনা প্রবাহ কবিতা গানে– এমনকি তার গদ্য, গল্প, নাটক, উপন্যাস বাদ যায়নি। নজরুলের সমাজ ভাবনা এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কবি যতীন্দ্র সেন গুপ্ত তার রচনাতে সমকালীন ঘটনার চিত্ররূপ বর্ণনা করেছেন; তাতে তার দুঃখ বোধ হতাশা বোধ ছাড়া কিছুই নয়। নজরুল কবিতা, গানে, নাটক, প্রবন্ধ, ছোট গল্প এমনকি চিঠিপত্রেও তিনি সমাজের সর্বক্ষেত্রের অধঃপতনকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি ক্ষোভ বিক্ষোভ অতঃপর প্রতিবাদ মুখর হয়ে বিদ্রোহী হয়েছেন। অসম সমাজ ব্যবস্থায়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যে গণমানুষের মুক্তি নেই, সেটি নজরুল বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। তার 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় সমাজের সাধারণ মানুষের যে দারিদ্র্য, অভাব দুঃখের নির্মম কষাঘাত তারই চিত্ররূপঃ

"বড় কথা বড় ভাব আসে না ক বন্ধু বড় দুখে
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।"

মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যের মাঝে কবি নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন, নিজের দুঃখ বোধ দারিদ্র্য আবিষ্কার করেছেন,

"ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ
চায় দুটো ভাত একটু নুন
বেলা বয়ে যায় খায় নি ক' বাছা
কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।" (আমার কৈফিয়ত)

নিম্নবিত্ত জীবনে যে অভাব দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী, কবি সে অভাবকে বরণ করে নিয়েছেন; কিন্তু তা সাময়িক একটি অত্যাচারিত নিপীড়িত শ্রমজীবী গণমানুষ জেগে উঠবে, সে দিন অত্যাচারী শোষক পালাবার পথ পাবে না। কারণ, পরাধীন বৃটিশ ভারতে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী সামন্তবাদী; অন্যদিকে তাদের দোসর মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার, তালুকদার, চাকলাদার, মহাজন, বিভিন্ন শোষক শ্রেণির জন্ম হয়েছে। যারা মানুষের অধিকার হরণ করে দাসত্বে পরিণত করেছিল। নজরুল এদের বিরুদ্ধে শ্রেণিহীন এক সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বললেনঃ

"পরের মুলুক লুট করে খায়
ডাকাত তারা ডাকাত
তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই
আঘাত শুধু আঘাত।"

সমাজের মানুষকে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুযোগ বুঝে একটি সর্বহারা জাতিতে পরিণত করেছে, সমাজের মানুষগুলোকে অর্ধমৃত বানিয়ে তারা নিজেদের সুরম্য সুদৃশ্য বিলাসী জীবনের জন্য ইমারত বানিয়ে সেখানে বাস করছেন। অথচ যাদের শ্রমে ঘামে ঐ রঙিন প্রাসাদ তাদের জাগাতে নজরুল বলেছেনঃ

"তুমি শুয়ে রবে তেতালার পরে, আমরা রহিব নীচে
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে।" (কুলি মজুর)

মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তিঃ অন্ন বস্ত্র বাসস্থানসহ রাজনৈতিক অধিকারকে যারা হরণ করেছে এ দেশের তেত্রিশ কোটি মানুষের দুর্ভাগ্যের জন্য যারা দায়ী, নজরুল তাদের সে দুঃশাসনকে প্রতিহত করতে ভারতের বীর জনতাকে সংগ্রাম করতে অনুপ্রাণিত করেছেন, সে ভাষা গ্রাস করতে অনুপ্রাণিত করেছেন, সে ভাষা অতীব শানিত ও তেজেদীপ্ত এবং সেই সংগ্রামে নিজের বুকের শেষ রক্ত বিন্দু ঢেলে দিতেও তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি বলেনঃ

"প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস।
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।"

এখানে নজরুলের ভাষা ও বাক্য ব্যবহারে যেন কুহেলিকা বা জড়তা নেই; স্পষ্ট ও জোড়ালো ভাষায় তিনি বৃটিশ শাসনের ধ্বংস কামনা করেছেন, কামনা করেছেন মানুষের মুক্তি।

নজরুলের তিনটি উপন্যাস ছোট গল্পেই সমকালীন সমাজ ভাবনার বাঙ্ময় চিত্ররূপ দেখতে পাইঃ "প্রমত দা, জাহাঙ্গীরকে আমাদের দলে নেওয়ায় আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না। সে হিন্দু কি মুসলমান, তা ভেবে দেখিনি! তাকে আমি দেখেছি মানুষ হিসাবে। সে হিসাবে! সে আমাদের সকলের চেয়েই বড়। কিন্তু এ নিয়ে শেষে আমাদের মধ্যে একটা মতান্তর না বাঁধে। আমরা বিপ্লববাদী, কিন্তু গোঁড়ামীকে আজও পেরিয়ে যেতে পারিনি- ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখিনি।" (সাম্প্রদায়িকতার চিত্রঃ কুহেলিকা, উপন্যাস)। লাঞ্ছিত প্রবন্ধে নজরুল বলেছেনঃ "রেল স্টিমার বিদ্যুৎ গাড়ি, কল কারখানা একটির পর একটি করিয়া মানুষের আরামের নিমিত্তে সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং ভোগের নিমিত্তে কোটি কোটি মনুষ্য পশুপাখী, অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন মনুষ্য পশুর দাসখত লিখিয়া দিতে

বাধ্য হইতে লাগিল। কেহ ধর্মের নামে, কেহবা সমাজ, শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে কোটি জীবনকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে লাগিল।"

নজরুলের গভীর সমাজবোধ তাঁকে তাড়িত করেছে সমাজে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী সাধারণ অসহায় দরিদ্র মানুষগুলোর ক্ষুধার্ত মুখ উঠে এসেছে বিখ্যাত উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধায়'।

"প্যাকালে না খেয়েই তার যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে এল। সে জানত কাল থেকে চালের হাঁড়িতে ইঁদুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা বসেছে। তাদের কিচিরমিচির বক্তৃতায় আর নেংটো ভলান্টিয়ারদের হুটোপুটির চোটে সারারাত তার ঘুম হয়নি।

... ক্ষীর রান্না হয়ে যায়। ছেলে মেয়েরা যে যেখানে যা পায়- থালা, বাটি, ঘটি, বদনা, তাই নিয়ে উনুন ঘিরে বসে যায়। অপূর্ব সেই ক্ষীর। অদূরে দারোগা মির্জা সাহেবের বাড়ি। তাঁরই বাড়ির দুধ বেড়ালে খেতে না পেরে যেটুকু ফেলে গিয়েছিল তাই দারোগা গিন্নি পাঠিয়ে দিয়েছেন এদের বাড়ি। তার অপার করুণা, তাই সে স্বল্প দুধে জল মিশিয়ে আধাপোয়া দুধকে আধসের করে ঝি-র হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই না চাইতেই জল পেয়ে এদের সকলের চোখ দিয়ে যে কৃতজ্ঞতার জল পড়িছে, তা ওই আধসের জলের অনেক বেশি। বাড়িতে চলেছিল সেদিন চাল বাড়ন্ত। মুরগীর সদ্য খোলা হতে উঠা বাচ্চাগুলির জন্য যে খুদ গুঁড়ার রিজার্ভ স্টোর ছিল ছটাক তিনেক, দারোগা-বাড়ির দুগ্ধ সংযোগে তাই সিদ্ধ হয়ে হল এই উপাদেয় ক্ষীর। এই ক্ষুধিত শিশুদের এই আজকের সারা দিনের আহার। এই তাদের ক্ষীর পরম ঈদ।" (দুর্ভিক্ষের চিত্র : মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাস)।

নজরুলের উপন্যাসে সমকালের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন রূপ সচেতনভাবেই চিত্রিত করেছেন। রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক, এমনকি ব্যক্তিগত দিক তার রচনায় স্থান পেয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সাহিত্য ও শিল্পকলায় বিষয়টি নতুন না হলে বাংলা সাহিত্যে নজরুল এককভাবে জাতীয় মনমানসিকে প্রধানত নিজের মত করে প্রকাশ করেছেন, এখানে তার নিজস্ব স্বকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের ভূমি সমস্যা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের "বাংলাদেশের কৃষক" প্রমথ চৌধুরীর "রায়তের কথা" প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। কিন্তু নজরুল বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন রূপে নতুনভাবে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে স্বরাজ কথাটি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতার এতকাল পরেও ভূমি সমস্যার কোন সমাধান হয়নি, দারিদ্র্য সমস্যা মূল সমস্যাই থেকে গেছে। নজরুল সাম্যবাদী দলের মাধ্যমে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার মূল সূত্র অনুধাবন করে তা আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা চালান। সাম্যবাদী দলের কনফারেন্সের সভাপতি শিঙ্গলডেবু মতামতকে তিনি সমর্থন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষক শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের সংগঠিত করতে হবে। কারণ তিনি বাস্তবতাবোধের কারণে এতটা সচেতন হতে পেরেছিলেন। জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। তাই তাঁর রচনাবলীতে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সমাজ পরিবর্তনের একটি ছায়াপাত প্রতীয়মান হয়েছে। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, শোষণ বঞ্চনা, দমন পীড়ন, উপেক্ষা, সামাজিক নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ, আবার তাতে পাশ্চাত্য প্রভাব তার প্রতিবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। পটভূমিতে তাঁর সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা ও মানস তাঁর অনেক রচনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এর নিগ্রহ নিক্ষেপণ তাঁর মানস চেতনাকে নিয়ত তাড়িত করেছে; তিনি তাঁর পরিবর্তন চেয়েছেন, এই পরিবর্তনই সাহিত্যে তাঁর রেনেসাঁস। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, যে স্বপ্নের ধ্যান করতেন, তাকে বাস্তবায়ন করতে কুণ্ঠিত হন। সুতরাং সাহিত্যে তাঁর রেনেসাঁস উজ্জীবিত হয়ে আছে। যা সকল শ্রেণি পেশার মানুষের মাঝে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে মানব বিপ্লব সাধন করেছে। মানস চেতনা দান করে তাদের উদ্দীপ্ত করেছে, সাহিত্যে এই চেতনাই নজরুলের রেনেসাঁস।

নজরুল সাহিত্যে দেশাত্ববোধ ও স্বাধীনতা চেতনা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এর কাব্য ও সাহিত্য জীবনের আবির্ভাব ঘটেছে বাংলা তথা বৃটিশ ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কাল প্রেক্ষাপটে। সেই সময়ের সমাজ সভ্যতা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক শোষণ নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, ধর্মীয় অন্ধত্ব গোঁড়ামী ও কুসংস্কার, কিছুই এড়িয়ে যায়নি তাঁর লেখনী থেকে। একটি দেশের সামগ্রিক বিষয়কে তিনি তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। তাঁর কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রবন্ধ সকল কিছুতেই তার কাছে প্রাধান্য পেয়েছে দেশ, দেশের মানুষ, দেশের পরাধীনতা। একটি পরাধীন দেশের মানুষ কখনও সুষ্থ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না, বাঁচতে পারে না, যা সত্যি অমর্যাদাকর। আর এটি বুঝতে পেরে তিনিই প্রথম স্বাধীনতার দাবী উচ্চারণ করেন বলিষ্ঠ কণ্ঠে:

"স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথি এক এক করে থাকেন। ভারতের এক পরমাণু অংশও বিদেশিদের অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশির মোড়লীর অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছেন তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে বোঁচকা-পুটলী বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তারা শুনবেন, তাদের অতটুকু সুবুদ্ধি এখনো হয়নি। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু দূর করতে হবে।" (১৩ অক্টোবর ১৯২২-১৩শ সংখ্যা ধূমকেতু (কোলকাতা)। দেশাত্ববোধ ও পরাধীন মাতৃভূমির জ্বালা নজরুল অনুভব করেছেন সমগ্র দেহমন হৃদয় দিয়ে। তাই এমন

জ্বালাময়ী ভাষায় স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছেন। তার দেশাত্মবোধের আবেগ তাকে ভারত মাতার পরাধীনতার গ্লানি হিসেবে অনুপ্রাণিত করেছে। সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা, স্বরাজের দাবী, মিথ্যা আশা তাকে আহত করেছে, স্বাধীনতার দাবী করার অক্ষমতা, নেতাদের ভীরুতা, ভন্ডামীতে নজরুল দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণ করেছেন:

"ভারত হবে ভারতবাসীর এই কথাটাও বলতে ভয় সেই বুড়োদের বলিস নেতা, তাদের কথায় চলতে হয়। বল রে তোরা বল নবীন-চাইলে এসব জ্ঞান-প্রবীণ! স্ব স্বরূপে দেশকে ক্লীব, করছে এরা দিনকে দিন, চায় না এরা হই স্বাধীন। কর্তা হবার সুখ সবারই, স্বরাজ-ফরাজ ছল কেবল, ফাঁকা প্রেমের ফুসমন্তর, মুখ সরল আর মন গরল। শুধু যে সাম্রাজ্যবাদী নয়; স্বরাজবাদী নেতাদের উপর নজরুলের এই বিদ্রুপ নয়, স্বদেশী আন্দোলনে অহিংসবাদীদের উপরও তাঁর তীব্র বিদ্রুপ ঝরে পড়েছে। শুধু অনুনয় বিনয় করলে তারা শুনবে কেন! তারা তোরজোর করেই এদেশের শাসন করার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। সুতরাং জোর করেই তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হবে। নজরুল সেই সহিংস ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দিকেই দেশবাসীকে ইঙ্গিত করেছেন। সন্ত্রাসবাদী সকল যোদ্ধাও আন্দোলনকারীর সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল বলেই বোঝা যায়। স্বরাজ কিংবা অহিংসনীতিতে নজরুলের কোন বিশ্বাস ছিল না। তিনি সশস্ত্র বিপ্লব বা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তরুণ মুক্তিসেনা যুবসেনার মাধ্যমেই যে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা আসতে পারে সেটি তিনি জোর দিয়ে বলেছেন।

"আমরা জানি সোজা কথা পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ ধামা-ধরা! জমা-ধরা! মরণ-ভীতু! চুপরেহা! আমরা জানি সোজ কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ! এই দুলালুম বিজয় নিশান! মরতে আছি, মরব শেষ নরম গরম পচে গেছে, আমরা নবীন চরম দল। ডুবেছি না ডুবতে আছি, স্বর্গ কিংবা পাতাল-তলা।" বৃটিশ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা তা বিষের বাঁশি কাব্যের একটি প্রধান দাবী। আলোচ্য কবিতাটিতে সমকালীন রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব পটভূমিকায় রচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় আরো অনেক কবিতা গানে নজরুলের স্বাধীনতা চেতনা ও দেশাত্মবোধ বলিষ্ঠভাবে ধরা পড়েছে। তার মধ্যে অন্যতম রক্তাম্বর ধারিণী মা। রক্তাম্বর ধারিণী মা ও আগমনী কবিতাটি অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটিতে কবি কালী মায়ের স্নেহমাখা রূপ পরিবর্তন করে সাদা আটপৌরে ব্যাসন ছেড়ে চণ্ডিমূর্তি ধারণ করে, অশুভ শক্তির বিনাশ সাধন করতে আহ্বান করেছেন। জগত সংসারে যখন কোন অত্যাচার অবিচার ও মানবতার অপমানসহ ধর্মের গ্লানিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তখন সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকল্পে মহামানব ও দেবতারা অবতার রূপে মর্তে আবির্ভূত হয়েছেন। যদিও নজরুলের কালীমাতার আগমন কামনা এটি কোন দৈবিক চাওয়া নয়, এটি জাগতিক রূপে দেশাত্মবোধের মাধ্যমে গণমানুষের চৈতন্য কামনা করে দেশমাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে প্রতীকি কল্পনায় আহ্বান করেছেন। যেমনটি রুশ ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিমগোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) তার মা উপন্যাসের মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের শোষণ থেকে জেগে উঠতে রুশ মাতাকে আহ্বান করে সমগ্র রুশ জাতিকে জেগে উঠতে আহ্বান করেছেন। এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে, নজরুল বাংলা কাব্য সাহিত্যে হৈ হৈ করেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে তার প্রবেশ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত। দেশাত্মবোধের প্রবল বেগ ও আবেগ বাংলা সাহিত্যে নজরুল এক প্রবলভাবে নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। শুধু যে কাব্যে তা নয়; গদ্যেও তার দেশাত্মবোধ প্রবলভাবে ধরা পড়েছে। গল্প-উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায় তার দেশাত্মবোধের পরিচয় সুস্পষ্ট। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' থেকে নির্ঝর, গল্প উপন্যাস 'ব্যথার দান' থেকে 'বাঁধন হারা' এবং প্রবন্ধ যুগবানী থেকে রাজবন্দীর জবানবন্দী পর্যন্ত তিনি দেশপ্রেমের এক অনন্য দ্বীপ শিখা জেলে রেখেছেন।

নজরুল বিশেষজ্ঞ কবি ও ছান্দসিক আব্দুল কাদির বলেছেন, "নজরুলের দেশাত্মবোধের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা নানাজন নানাভাবে করেছেন। রাজনীতিক পরাধীনতা ও অর্থনৈতিক পরবশতা থেকে তিনি দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি চেয়েছিলেন; তারপরও তিনি নির্দেশ করেছিলেন। সেদিনের সে পথকে কেউ ভেবেছেন সন্ত্রাসবাদী, কারণ তিনি ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের উদাহরণ দিয়ে তরুণদের বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে আহ্বান করেছিলেন; কেউ ভেবেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিয়মতান্ত্রিক কারণ তিনি চিত্তনামা লিখেছিলেন, কেউ ভেবেছেন তিনি প্যান ইসলামিজম, কারণ, তিনি আনোয়ার পাশার প্রশস্তি গেয়েছিলেন; আবার কেউ ভেবেছেন তিনি মহাত্মা গান্ধীর চরকাতত্ত্ব নিয়ে তিনি চরকার গান গান্ধীজীকে শুনিয়েছিলেন। আসলে এর কোনটিই তার স্বরূপ উদঘাটনে সহায়ক হয়নি। সত্যিপক্ষে প্রথম যুগে তিনি কামাল আতার্তুকের সুশৃঙ্খল সংগ্রামের পথই ভেবেছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা সঠিক পথ।" অন্যদিকে নজরুল সুহৃদ কমরেড মুজাফফর আহমেদ বলেন, "ব্যথার দান গল্পের ভেতর দিয়েই বৃটিশের ভারতীয় সৈনিক বিশ বছরের যুবক নজরুল ইসলাম যে রুশ বিপ্লব ও আন্তর্জাতিকতাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়।" (কাজী নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে পৃ: ৬২১)। এখানে একথা বলার অর্থ এই যে, নজরুল এভাবেই আন্তর্জাতিকতা বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশের মুক্তির পথ নির্দেশ করেছিলেন। বস্তুত দেশাত্মবোধের যুগে আমরা নজরুলকে দুভাবেই কাব্য ক্ষেত্রে পেয়েছি। নজরুল নিজের কথায় তা বলার চেষ্টা করেছেন।

"মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ তূর্য।" এখানে তার ব্যক্তি প্রেম ও স্বদেশপ্রেম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। একদিকে তার কাব্য অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, অন্যদিকে দোলনচাঁপা, ছায়ানট, পুবের হাওয়া এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। একই পর্বে নজরুলের এই সমন্বয় আমাদের মন-মানসে অপূর্ব দোলা জাগায়।

নজরুল যে রাষ্ট্রের চেতনায় তাড়িত হয়েছেন, যে রাষ্ট্রের স্বপ্নে বিভোর হয়ে তিনি একটি গণতান্ত্রিক সমাজ বা ডেমোক্রেটিক মোসালিজম এর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি স্বীয় মতবাদকে 'লাঙ্গল' পত্রিকায় তুলে ধরতে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে কমরেড মুজাফফর আহমদ বলেন, নজরুলের এই যুগটি তাঁর সক্রিয় রাজনীতির যুগ, এই যুগে তিনি বাংলাদেশসহ সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন। বক্তৃতা দিয়েও আন্দোলন করেছে। তার আন্দোলন শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; কিংবা আন্দোলন কৃষক ও জেলেদের ভিতরেও। (কাজী নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে/পৃ: ৮৮)

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন বিয়ের পরই নজরুল সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। যেমনটি কমরেড মুজাফফর আহমদ বলেন, "বিয়ে করার পর সে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করল। এই যুগে বাংলাদেশের সর্বত্র সে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন ও আন্দোলন করেছেন। তাঁর আন্দোলন শুধু যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সে আন্দোলন করেছে কৃষক ও জেলেদের ভিতরেও।" নজরুল তাঁর সাহিত্য জীবনের সেই যুগে যে রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলা হয়ে থাকে। এই মতবাদকে তিনি 'লাঙ্গল' পত্রিকায় তুলে ধরেন ও সক্রিয় রাজনীতির অনুশীলন শুরু করেন। 'লাঙ্গল' মূলত শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র। এই স্বরাজ পার্টি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে গঠিত হয়। শুধু তাই নয় এই দলের প্রথম ইশতেহার কাজী নজরুল ইসলামের দস্তখতেই প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছিল। যার অফিস ছিল ৩৭ হ্যারিসন রোড, কোলকাতা। নজরুল 'লাঙ্গল' পত্রিকাকে তার মতবাদ ও বক্তব্য প্রচারের প্রধান হাতিয়ার মনে করতেন। ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৫ তারিখে কমরেড মুজাফফর আহমেদের মতে-লাঙ্গল কাজের প্রথম সংখ্যায় নজরুলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য। আধুনিক কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ো স্টিমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকারী জিনিস লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎ সংক্রান্ত কর্মীগণের তত্ত্বাবধানের জাতীয় সম্পত্তি রূপে পরিচালিত হইবে। ভূমির চরম অনুস্বত্ব আত্মলাভ পূরণক্ষম স্বায়ত্তশাসন বিশিষ্ট পল্লীতন্ত্রের উপর বর্তিবে। এই পল্লীতন্ত্র ভদ্রশূদ্র সকল শ্রেণি পেশার তথা শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে। অন্যদিকে কবি বলেন, "হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে মজুর ভাইরা? তোমার হাতের লাঙ্গল আজ বলরাম স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ত তেজে গগণের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক এই অত্যাচারীর বিষ উপড়ে ফেলুক, উল্টে ফেলুক। আন তোমার হাতুড়ি। ভঙ্গ ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ। ধুলায় লুটাও অর্থ পিশাচ বল দর্পীর শির। ছোড়ে হাতুড়ি, চালাও লাঙ্গল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্তমাখা লালে লাল ঝান্ডা। যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের পায়ের তলায় আন। সকল অহংকার তাদের চোখের জলে ডুবাও।" (রুদ্রমঙ্গল প্রবন্ধ-নজরুল)

এ প্রসঙ্গে কবি আব্দুল কাদির বলেন, "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এর প্রতি নজরুলের প্রগাঢ় অনুরাগ তার কাব্যগ্রন্থ সর্বহারা, সাম্যবাদী, ফণিমনসাসহ বহু কবিতায় সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে। মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের আনসার চরিত্র সমাজবাদের আদর্শ বিকশিত হয়েছে।" ড. আহমদ শরীফ বলেন, "সাম্যবাদী, সর্বহারা ও ফণিমনসার কবিতাগুলো এ অঙ্গীকারের অনুগত। নজরুলের এই আদর্শ সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত, সর্বহারা গণমানুষের প্রতি অসীম দরদ ও ভালবাসা ফুটে উঠেছে। নজরুলের রাজনীতি কৃষক শ্রমিক তাঁতী জেলে মুটে মজুরসহ সমাজের নিচু তলার মানুষকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। আর তাদের জাগরণের জন্যই তিনি গণসাহিত্য বা রাজনৈতিক সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর শ্রমিকের গান, কৃষকদের গান, কুলি মজুর রচনা প্রভৃতি অন্যতম। তার শ্রমিকের গানে শ্রমিক শ্রেণির প্রতি যে দরদ ফুটে উঠেছে তার চিত্র:

"ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল!
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই
পায়ের সুখে ভাঙ্গব বল
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।

এছাড়া তাঁর 'কৃষকের গানে' তাদের প্রতি অসীম দরদ।

"ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙ্গল
আমরা মরতে আছি- ভাল করেই মরব এবার চল।
মোদের উঠান ভরা শস্য ছিল হাস্য ভরা দেশ,
ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে, লাঞ্ছনায় নাই শেষ।।"

অথবা লাঞ্ছিত শ্রমিক শ্রেণির জন্য যে অকৃত্রিম দরদ ও ভালবাসা তারই চিত্ররূপ:

"আসিতেছে শুভ দিন
দিনে দিনে বাহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ!
তুমি শুয়ে রবে তেতালার পরে, আমরা রহিব নীচে
অথচ তোমাদের দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে।" (কুলি মজুর)

নিখিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দলীয় সঙ্গীত রূপে দীর্ঘ কাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে যে গণসঙ্গীত:

"জাগো জাগো অনশন বন্দী, ওঠ রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত।
যত অত্যাচারে আজি বজ্রহানি
হাঁকে নিপীড়িত জন-মন মথিত বাণী
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ঐ আগত।।"

এ সকল গানে নজরুল যে শ্রেণিহীন সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলেছেন, তাতে সমাজ পরিবর্তনের যে বর্ণনা দিয়ে তাঁর রূপরেখার চিত্র ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে

বাঙালির সমাজ তথা রাজনৈতিক জীবনের এক রেনেসাঁস সংঘটিত হয়েছে। যে রেনেসাঁসের দোলা তার সমকালের সকল কবি সাহিত্যিক শিল্পী বুদ্ধিজীবী মহলেরও মানস বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নজরুল সুহৃদ কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ বলেন,

'নজরুলের সাম্যবাদ একেবারে মার্কসবাদ শূন্য নয়।' সমাজে যে শ্রেণি সংগ্রাম আছে, তা এই কবিতায় ধরা পড়েছে এবং শ্রেণি সংগ্রামের পরিণতি যে মজুর শ্রেণির নেতৃত্বে, ক্ষমতা অধিকার এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে– তাও স্বীকৃত হয়েছে এ কবিতায়। শুধু তাই নয়, সাহিত্যে গণমানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা দাবী করার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার ও দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর আদালত। তাঁর গ্রেপ্তারের খবরটি সমকালের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এভাবে:

"ধূমকেতু সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম গতকল্য বেলা বারটার সময় কুমিল্লাতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাহার নামে পূর্বেই ওয়ারেন্ট বাহির হইয়াছিল।" (২৪ শে নভেম্বর - ১৩২৯ বাংলা)। এ দিকে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাঁর বিচারের রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সে সম্পর্কে ধুমকেতু পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে।

"ধূমকেতু সারথি, প্রতিষ্ঠাতা, উদ্দাম, উন্মাদ শ্রীমান কাজী নজরুল ইসলাম বুরোক্রেসীর ব্যবস্থায় বৃটিশ রাজদ্রোহের অপরাধে দোষী সাবস্ত্য হয়ে এক বছরের জন্যে কঠিন কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছেন।"

নজরুল শুধু রোমান্টিক স্বাপ্নিক কবি নন; তিনি এক সমকালীন সমাজ রাষ্ট্রনৈতিক দ্রষ্টা, গণচেতনার সারথি, মানব প্রেম ও মানব মুক্তির দিশারী। তাঁর কবিতা গান ও সাহিত্যে দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার অভিসারী হবে এটাই স্বাভাবিক। আর এই গণচেতনা ও দেশাত্মবোধের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি সাহিত্যের শিল্পমান অনেক ক্ষেত্রে ধরে রাখতে পারেননি; তবে, বাংলা ও বাঙালির রেনেসাঁয় তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি বললেও কম বলা হবে। বস্তুত ধূমকেতু সারথি কাজী নজরুল ইসলাম এভাবেই রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হয়ে অত্যাচারিত, নির্যাতিত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন। নজরুল ইসলামকে মোতাহার হোসেন চৌধুরী যথার্থভাবে চিহ্নিত করেছিলেন:

"রবীন্দ্রনাথের যেমন 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' নজরুলের তেমনি 'বিদ্রোহী'। এখান থেকেই তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর একটি মিশন আছে- অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে গান গাওয়া। বিদ্রোহীর পরে ধূমকেতু রচিত হল, এ কবিতা কাব্য হিসাবে নিকৃষ্টতর হলেও বিদ্রোহের মিশন তাতেই ভালো ফুঁটেছে।" এ বিদ্রোহ অস্পষ্ট ছিল না।

নজরুল সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িকতা

বিস্ময়কর কবি প্রতিভা নিয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগমন এক যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলা সাহিত্যে শিল্পের সকল শাখায় সফল অবদান রেখে, তিনি সব্যসাচীর পরিচয় দিয়েছেন। তবে অপরাপর কবি সাহিত্যিক এর মত তিনি গতানুগতিক ধারায় সাহিত্য রচনা করেননি। তাঁর সাহিত্য রচনায় রয়েছে নিজ সত্তা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বকীয়তা মৌলিকত্ব ও নিজস্ব স্টাইল। তাকে আধুনিক বাংলা কবিতার তৃতীয় ধারার প্রবর্তক বলা হয়ে থাকে। রবীন্দ্র সমকালে যে কয়জন কবি প্রতিভা রয়েছেন; নিঃসন্দেহে বলা যায় কাজী নজরুল ইসলাম তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক কবি প্রতিভা। যদিও তাঁর মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সমালোচকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে, সমালোচনা যাই থাকুক, কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"কৈশোর কালে আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরোবার ইচ্ছেটাকে অন্যায় মনে হতো যেন রাজদ্রোহের শামিল; আর সতেন্দ্রনাথের তন্দ্রাভরা নেশা, তার বেলোয়ারী আওয়াজের আকর্ষণ – তাও আমি জেনেছি। আর এই নিয়ে বছরের পর বছর কেটে গেলো বাংলা কবিতার; আর অন্য কিছু চাইলো না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব বলেও ভাবতে পারলো না যতদিন না বিদ্রোহী কবিতার নিশান উড়িয়ে হৈ হৈ করে নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।"

যে কবি রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে সমগ্র বাঙালি জাতিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন বুঝতে হবে, তিনি পৃথিবীর মহৎ মানবিক ও স্বকীয়তা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের দ্বারা নিজস্ব স্টাইল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন; এজন্য তিনি কারও প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে অনুকরণ– অনুসরণের দ্বারা ঋণগ্রস্ত হননি। কবিতা-গান ও সাহিত্যে তিনি যে নিজস্ব ধারা তৈরী করতে সক্ষম হলেন, এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় আবহে অনেক কবি প্রভাবিত হয়েছিলেন, তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার সাথে ধর্মীয় চেতনাকে যুক্ত করে ধর্ম মিশ্রিত এক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক উন্মাদনা সৃষ্টিতে প্রয়াস পান। যার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে। এতে করে ভারতীয় হিন্দু-মুসলিমের দীর্ঘকালের এক সম্প্রীতির বন্ধন নষ্ট হতে থাকে। আর এই অপপ্রয়াসে যে সকল হিন্দু বরেণ্য কবি-গীতিকার ও সাহিত্যিকগণ দেশাত্মবোধের নামে সাম্প্রদায়িক চেতনা ও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হন মুসলিম জাতির প্রতি বিদ্বেষ ছড়াতে তাদের যেন মুক্তি নেই, এদের মধ্যে অন্যতম। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: আনন্দ মঠে লিখলেন, "ইংরেজরা আমাদের অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ইংরেজী

আমাদের শত্রু নহে; ইংরেজের জয় হউক।" কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তার ভারত সঙ্গীতে লিখলেন: "না থাকিলে ইংরাজ ভারত অরণ্য তাজ
কে দেখাত, কে শিখাত কে বা পথে লয়ে যেত
যে পথ অনেক দিন করেছে বর্জন।" এই যুগে তিনি আরো প্রচার করলেন, যে হিন্দুদের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়েছে: পাঠান, মোগল, পারস্য দুমর্তিদের হাতে। আর এজন্য তিনি হিন্দুদের ধিক্কার দিয়ে লিখলেন:
"ধিক হিন্দু কুলে। বীর ধর্ম ভুলে
আত্ম অভিমান ডুবালে সলিলে
দিয়াছ সপিয়া শত্রু করতলে
সোনার ভারত করিতে ছার।"
রঙ্গলাল লিখলেন :
"ভারতের ভাস্যজোর, দুঃখ বিভাবরী ডোর
ঘুমঘোর থাকিবে কি আর?
ইংরেজের কুপাবলে মানস উদয়া চলে
জ্ঞান ভানু প্রভায় প্রচার।"
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ, মৃণালিনী, সীতারাম; ভুদেব মুখোপাধ্যায় রচিত অংগুরীর বিনিময়; রমেশ চন্দ্র দত্তের বঙ্গবিজেতা, রাজপূত জীবন সন্ধ্যা, মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত; রঙ্গলালের পদ্মিনী, কমদেবী, সুর সুন্দরী; হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের ভারত উচ্ছ্বাস; পলাশী যুদ্ধ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শাহজাহান, নূরজাহান, দুর্গাদাস; রবীন্দ্রনাথের মুসলমানদের বেলায় যবন শব্দের ব্যবহার, শিবাজী উৎসব, বন্দীবীর, হোলিখোলা, দালিয়া, দূরাশা প্রভৃতি লেখায় সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানো হয়েছে, এতে করে বাংলার হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক আরো তিক্ত করে দিয়েছে। ফলে বাংলা তথা ভারতীয় হিন্দুগণ আরো মুসলিম বিদ্বেষী হয়েছে। যার প্রভাব বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দুদের দ্বারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। একমাত্র নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাটক নীল দর্পণেই অত্যাচারী হিসেবে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে অত্যাচারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। এই নাটকে গরীব ভূমিহীন মজুর চাষীদের জীবনের মর্ম বেদনা ফুটে উঠেছে এবং তাদের প্রতিরোধ করার চেতনার চিত্র দেখা যায়। সমগ্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন চরমে জালিয়ানওয়ালাবাগে এক জনসভায় বৃটিশ সেনাবাহিনীর জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে নিরস্ত্র মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করলে হিন্দু মুসলিমের রক্তে পাঞ্জাবের সবুজ ভূমি রঞ্জিত হলো। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। এমনি একটি যুগ প্রেক্ষাপটে বাঙলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। যার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি এক উদার মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা পরিপূর্ণ ছিল। হিন্দু মুসলমানের মিলন কামনাই তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। তাই তাঁর কাব্যে ও সাহিত্যে উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের সুর ধ্বনিত হয়েছে বার বার।
নজরুলের অসংখ্য কবিতায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূর্ত প্রতীক ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি অসংখ্য হিন্দুয়ানী শব্দ ও মুসলমানি শব্দ কাব্য রচনায় ব্যবহার করেছেন যার নমুনা :
"ঘরে ঘরে তাঁর লেগেছে কাজিয়া
রথ টেনে আন আনরে তাজিয়া,
পূজা দেরে তোরা, দেরে কোরবান।
শত্রুর গোরে গলাগলি কর, আবার হিন্দু মুসলমান
বাজাও শঙ্খ, দাও আজান।"
(কাব্য : যা শত্রু পরে পরে : ফনি-মনসা)
নজরুল কাব্যে এভাবেই, কাজিয়া, রথ, তাজিয়া, পূজা, কোরবান, গোর, শঙ্খ, আজান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে হিন্দু মুসলিম ধর্মীয় আচার ও রীতি প্রথার যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তার মর্যাদা দিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। নজরুলের কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধেও তার অসংখ্য নজির দেখানো যাবে। তিনি যেমন হিন্দু মুসলিম মিলনের প্রয়াসে কবিতায় যে সমতা ও অসাম্প্রদায়িকতার ব্যথা বলেছেন তা সুস্পষ্ট ও সোচ্চার অন্যত্র তেমন চিত্র পাওয়া যাবে না।
"গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাঁধা ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রীস্টান।" (সাম্যবাদী)

একই চেতনা থেকে একদিকে তিনি ইসলামী সঙ্গীত যেমন রচনা করেছেন তেমনি অসংখ্য শ্যামা সঙ্গীত, শিব সঙ্গীত, রাধা কৃষ্ণের প্রেমগীতিও রচনা করেছেন। সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণিমনসার মত কাব্যগ্রন্থ রচনা করে তিনি উদার মানবিক ও আন্তর্জাতিক মন-মানসের পরিচয় দিয়েছেন। একজন কবি কতটা নৈর্ব্যক্তিক অসাম্প্রদায়িক হলে এ ধরণের কাব্য সাহিত্য রচনা করে মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারেন। নজরুলের মত অসাম্প্রদায়িক কবি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়; বিশ্ব সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবুও কোন কোন মহল তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যায়িত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন; কিন্তু তা দেশবাসীর কাছে ধোপে টেকেনি। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নজরুলই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্য মজবুত ও দৃঢ়তার সাথে বেঁধে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়; তিনি জীবনভর তার সে জীবন চর্চায় ও অনুশীলনে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বিয়েও করেছিলেন অমুসলিম পরিবারে। প্রতিটি দেশেই ধর্মের নামে জাতির নামে যে সংঘাত হানাহানি তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু নজরুল এই ধর্মের নামে হানাহানি দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে ভারতের হিন্দু মুসলিমের ঐক্য ও মিলন বাসনা

করেছেন। আর তারই প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ২ এপ্রিল কোলকাতায় রাজ রাজেশ্বরী মিছিলকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানের মাঝে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছে। এতে করে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট নাকচ হয়ে যায়। তাতে নজরুল ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এই সময়ের কিছু কবিতা গান ও প্রবন্ধ রচনা করেন-যাতে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার সচিত্র প্রতিবেদন প্রবলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতাগুলোর মধ্যে হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ, পথের দিশা, কান্ডারী হুঁশিয়ার; প্রবন্ধের মধ্যে : হিন্দু মুসলিম, মন্দির-মসজিদ, প্রবন্ধ দুটো অন্যতম। কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধ দুটোতে তাঁর উদ্বিগ্নতাও ব্যথিত হওয়ার চিত্র ফুটে উঠেছে।

"মাভৈঃ মাভৈঃ এতদিনে বুঝি- জাগিল ভারতে প্রাণ
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান - গোরস্থান।
ছিল যারা চির-মরণ - আহত,
উঠিয়াছি জাগি ব্যথা-জাগ্রত,
'খালেদ' আবার ধরিয়াছে অসি 'অর্জুন' ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান!
মরিছে হিন্দু, মরে মুসলিম এ উহার ঘায়ে আজ,
বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ মরণে নাহি লাজ।"

(হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ)

প্রতিটি কবিতায় তিনি বাংলা তথা ভারতের সমকালীন সাম্প্রদায়িকতার যৌগ এঁকেছেন; তাতে তার বিক্ষুব্ধ মনের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করার মত। সেখানে তার বিদ্রূপাত্মক বাক্য ঝরে পড়েছে। কবি বলেন:

"ভগবান আজ ভূত হল যে, পড়ে দশ চক্র ফেরে, যবন এবং কাফের মিলে হায় বেচারায় ফিরছে তেড়ে বাঁচাতে তায় আসছে কিরে নতুন যুগের মানুষ কেহ? ধুলায় মলিন, রিক্তভরণ, সিক্ত আঁখি, রক্ত দেহ? মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার, রে অগ্রদূত ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠকালা পাহাড়? জানিস যদি, খবর শোনা বন্ধ খাঁচার ঘেরাটোপে।"

(কাব্য: পথের দিশা)

মোল্লাতন্ত্র ও পুরততন্ত্রের যে বদমায়েশির আখড়া মসজিদ ও মন্দির, তিনি তাকেও কটাক্ষ করতে দ্বিধা করেননি। নজরুলের জাতীয়তাবাদী মনমানস দুই জাতির অন্তর্দ্বন্দ্ব - সংঘাতের যে চিত্র তার, 'যা শত্রু পরে পরে' কবিতায় দেখা যায়।:

"ঘর সামলে নে এই বেলা তোরা ওরে হিন্দু ও মুসলেমিন
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন!
ধর্ম-কলহ রাখ দুদিন
নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া
গণ্ডূষ ফের করিবি কাচিয়া
আসিবে না ফিরে এই সুদিন।
বদনা গাড়ুতে কেন ঠুকাঠুকি
কাছা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীণ
সিংহ যখন পঙ্ক-লীন।"

বস্তুত ৩ অমর কবিতা থেকে নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা সহজেই চিহ্নিত করা যায়। যা অন্য কোনো কবির কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানস চেতনার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হিন্দু মুসলমান ও মন্দির মসজিদ শীর্ষক প্রবন্ধ দুটি। নজরুলের মন্দির মসজিদ প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। নজরুলের ভাষায়: "মারো শালা যবনদের মারো শালা কাফেরদের। আবার হিন্দু মুসলমানি কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল, তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম– তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকরানির নাম লইতেছে না। হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে, 'বাবা গো, মা গো', মাতৃপরিত্যাক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে।" (মন্দির মসজিদ)"

প্রবন্ধের অন্যত্র নজরুল বলেন, "এক স্থানে দেখিলাম, ঊনপঞ্চাশ জন ভদ্র-অভদ্র হিন্দু মিলিয়া একজন শীর্ণকায় মুসলমান মজুরকে নির্মমভাবে প্রহার করিতেছে, আর একস্থানে দেখিলাম প্রায় ওই সংখ্যক মুসলমান মিলিয়া একজন দুর্বল হিন্দুকে পশুর মত মারিতেছে।" এরপর নজরুল মন্তব্য করেন। "দুই পশুর হাতে মার খাইতেছে দুর্বল অসহায় মানুষ। ইহারা মানুষকে মারিতেছে, যেমন করিয়া বুনো জংলি বর্বরেরা শূকরকে খোঁচাইয়া মারে। উহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, উহাদের প্রত্যেকের মুখ শয়তানের চেয়েও বীভৎস, শূকরের চেয়েও কুৎসিত হিংসায়, কদর্যতায় উহাদের গাত্রে অনন্ত নরকের দুর্গন্ধ!" তিনি আরো বলেন: "দেখিলাম আল্লার মসজিদ আল্লা আসিয়া রক্ষা করিলেন না, মা কালীর মন্দির কালী আসিয়া আগলাইলেন না। মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিল, মসজিদের গম্বুজ টুটিল। আল্লার এবং কালীর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। আকাশ হইতে বজ্রাঘাত হইল না মুসলমানের শিরে, "আবাবিলের" প্রস্তর বৃষ্টি হইল না হিন্দুদের মাথার উপরে। এই গোলমালের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু ছেলে আসিয়া গোঁফ-দাড়ি কামানো দাঙ্গায় নিহত খাররু মিয়াকে হিন্দু মনে করিয়া, বল হরি হরি বোল বলিয়া শ্মশানে পুড়াইতে লইয়া গেল এবং কতক মুসলমান ছেলে গুলি খাওয়া দাড়িওয়ালা সদানন্দ বাবুকে মুসলমান ভাবিয়া, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়িতে পড়িতে কবর দিতে লইয়া গেল। মন্দির এবং মসজিদ চিড় খাইয়া উঠিল, মনে হইল যেন উহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।" (মন্দির-মসজিদ)

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৯ চৈত্র কলিকাতায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। নজরুল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরসনে আপ্রাণ প্রয়াস চালান। তিনি একবার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আবার মুসলিম লীগ নেতাদের কাছে ছুটে যান এবং সাম্প্রদায়িকতা বন্ধে ভূমিকা রাখতে অনুরোধ করেন। একজন কংগ্রেস নেতাতো

নজরুলকে উপহাস করে বলেই দিলেন, "আপনি হলেন গিয়ে মহাপ্রাণমানুষ, আমরা হলেম গিয়ে অল্প প্রাণ মানুষ"। নজরুল ব্যথিত মনে ফিরে এলেন। কিন্তু, তিনি তাঁর প্রচেষ্টা কবিতা গান ও সাহিত্য সাধনায় অব্যাহত রাখলেন। তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার বৈশিষ্ট্য তিনি কঠোরভাবে বজায় রেখেছেন। হিন্দু সমাজের অন্ধত্ব ও কুসংস্কার তুলে ধরতে তিনি লিখলেন জাতের নামে বজ্জাতি কবিতায়:

"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাতে
জালিয়া খেলছে জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে?
জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।
বলতে পারিস বিশ্ব পিতা।
ভগবানের কোন সে জাত।
কোন ছেলের তার লাগলে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ? (জাতের বজ্জাতি)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে, স্বদেশী, সন্ত্রাসবাদী, অসহযোগসহ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন অব্যাহত ছিল। একদিকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আবার অন্য দিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ চিত্র, দুই দিকেই নজরুল কবিতা গান-প্রবন্ধ লিখে জাতীয় চেতনা দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জাতীয় দুর্যোগ ও সাম্প্রদায়িক প্রেক্ষাপটে নজরুলের বিখ্যাত কবিতায় সত্যিই নজরুল কান্ডারীর ভূমিকা পালন করেন: "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার লঙ্ঘিতে হবে রাত্রী নিশিতে, যাত্রীরা হুশিয়ার। দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ, ছিড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত? কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার"। অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে সওরন, কান্ডারী আজ, দেখিব তোমার মাতৃ মুক্তি পণ। হিন্দু না ওরা মুসলিম। ওই জিজ্ঞাসে কোন জন! কান্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।" (কান্ডারী হুঁশিয়ার, সর্বহারা)।

একটি আসরে গানটি গাইতে শুনে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু নজরুলকে ভারতের 'স্বাধীনতার প্রথম স্বাপ্নিক কবি বলে অভিহিত করেছিলেন'। তিনি আরো বলেন, "আমরা যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাব, তখন সেখানে নজরুলের গান গাইব, আমরা যখন কারাগারে যাব তখনও নজরুলের গান গাইব। নজরুলের "দুগর্ম গিরি কান্তার মরুর মত প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না"। (নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু)

কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক প্রেক্ষাপটে নজরুলের কবিতা গান প্রবন্ধ তথা সাহিত্য কর্ম যে প্রগতিশীলতার, যে উদার মানবিক ও অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়েছে তা অবিনশ্বর হয়ে আছে। নজরুলের এই আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক চেতনার দীপ শিখা বাঙালি জাতিসত্তার দুর্যোগ ও ক্রান্তিকালে বাঙালির মনন মনীষায় ও রেনেসাঁসে কাল-কালান্তর ব্যাপি পাথেয় হয়ে থাকবে। শুধু বাংলা সাহিত্য নয় নজরুল তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্ব সাহিত্যেও অদ্বিতীয় হয়ে আছেন।

বুদ্ধির মুক্তি ও বাঙালির রেনেসাঁয় কয়েকজন সারথি

বুদ্ধির মুক্তি ও বাঙালির রেনেসাঁয় যে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক প্রাবন্ধিক গবেষক-সমালোচক চিন্তাবিদ মুক্তবুদ্ধির রেনেসাঁ বা বিপ্লব ঘটিয়েছেন, প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সমকালীন তরুণ সমাজ ও মধ্যবিত্তের মাঝে তা সঞ্চালিত করতে সমর্থ হন। পরবর্তীকালে এই সকল কবি সাহিত্যিক চিন্তাবিদের অনেকেরই রাজনৈতিক পরিবর্তন হলেও মুক্ত চিন্তা ও মননশীলতার পরিবর্তন ঘটেনি। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলার জাতীয় জাগরণ লক্ষ্য করার মত। তাঁদের সাহিত্য সাধনায় রূপ ও রস সৌন্দর্য বিচারের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক একটি বিশ্লেষণ লক্ষ্য করবার মত। বাংলার অধঃপতিত সাধারণ মানুষের জীবন ধারা, তাদের দুঃখ বেদনা, তাদের অধিকার, তাদের দারিদ্র্য সব কিছুই উঠে এসেছে। এই মুক্ত চিন্তার নমস্য ব্যক্তিত্বগণ হলেন: কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, মীর মোশাররফ হোসেন, বিচারপতি আব্দুল মওদুদ, মনীষী আবুল হোসেন এবং সর্বশেষ কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম। এদের উদ্দেশ্যই ছিল নতুন চিন্তা, জ্ঞান ও তাঁর বিশ্লেষণ করে যুক্তির মাধ্যমে সত্যের কাছে উপনীত হওয়া। কোন কিছু অন্ধভাবে বিশ্বাস করে গ্রহণ নয়; বরং তা মুক্ত চিন্তা দিয়ে আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা। আর এতদ্বৎ উদ্দেশ্যে তারা স্বীয় কবিতা গান গল্প উপন্যাস এবং প্রবন্ধ লিখে বাঙালি জাতির মন-মানসে এক নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাদের চিন্তা জুড়েই ছিল অন্ধ বিশ্বাস নয়; বিবেকের সাথে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে তবেই গ্রহণ করতে হবে। অনেক রীতি প্রথার নামে কুসংস্কার, ধর্মের নামে অন্ধত্ব, অশিক্ষা আমাদের সমাজে জগদ্দল পাথরের মত বসে আছে। রেনেসাঁসের লেখকগণ সেই জগদ্দল পাথর সরল বিশ্বাসী খেটে খাওয়া মানুষগুলোর বুক থেকে নামিয়ে তাঁদের মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে অনুপ্রাণিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির রেনেসাঁর ইতিহাসে তাঁদের নাম অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। আমরা বাঙালি তাদের অবদানের কাছে চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী হয়ে আছি।

কাজী আবদুল ওদুদ উনিশ শতকের মুক্ত বুদ্ধির চর্চা ও বাঙালির মানস বিপ্লবের অন্যতম প্রবক্তা। মুক্ত বুদ্ধির আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে তাঁর সাহিত্য মানস ও রচনা প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সাথে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাদেরকে উদারনৈতিক সাহিত্য ধারার বাহক হিসেবে কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন। তবে, এই চিহ্নিতকরণ যথার্থ হতে পারে না; কারণ, একজন সাহিত্যিক যিনি সত্য ন্যায় ও সৌন্দর্যের সাধক, তিনি কখনো অনুদার হতে পারেন না। একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি কখনো মুক্ত বুদ্ধি চর্চার পরিপূরক হতে পারে না। সুতরাং যারা শুধু মুসলিম কিংবা হিন্দু বিশেষ জাগরণ দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যে জগৎ সমাজ সংসারকে দেখতে চেয়েছেন; তারা কখনোই মুক্ত বুদ্ধির চর্চার আন্দোলনের ধারক-বাহক হতে পারেন না। কাজী আবদুল ওদুদের রচনার প্রধান লক্ষ্য জাতীয় জাগরণ; বুদ্ধির মুক্তি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "বুদ্ধির মুক্তি বা বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তিদান।" এই অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্ত জাতীয় জাগরণই ছিল তার কাম্য। কিন্তু সাহিত্যে উদার নৈতিকতার প্রবক্তা হলেও পদ্ধতির দিক থেকে ভিন্নতর হয়েও তিনি মানস গঠনের দিক থেকে মুসলিম মনোভঙ্গিরই পরিচয় দিয়েছেন, ফলে উদারনৈতিক মনোভঙ্গির সীমাবদ্ধতা আরো সংকুচিত হয়েছে। আর সেই কারণেই তিনি বাঙালির মুক্ত বুদ্ধির জাগরণের আবেদন না জানিয়ে বাঙালি মুসলমানের জাগরণ কামনা করেছেন। যে কারণে তাঁর আবেদনে ত্রুটি ছিল সম্ভবত এইখানে যে, অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্ত করতে গিয়ে তিনি নিজেই সংস্কারের বশবর্তী হয়ে পড়েছেন– যে সংস্কার জন্ম দিয়েছে সমাজ ও ব্যক্তি মানসের সংগঠন ও ধর্ম সংস্কৃতির ভূমিকা সম্পর্কে একদেশদর্শী চেতনা থেকে। বাঙালি মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন সত্য। কিন্তু তাদের মানস গঠন সম্পর্কে যার মূলে রয়েছে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রেরণা, সে সম্পর্কে সংবেদনশীল আলোচনা করেননি। আর এইখানেই তার মুক্তবুদ্ধি চর্চার ত্রুটি। সূক্ষ্মতর বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও বাঙালির রেনেসাঁয় নায়ক ও মুসলিম সাহিত্য সমাজের যাঁরা সদস্য তাঁদের মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদ প্রধানত রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য হিন্দু মনীষীদের আদর্শ বেধে দিক নির্দেশনা গ্রহণের কথা, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.), পারসি কবি শেখ সাদী, জার্মান কবি গ্যেটে প্রমুখের আদর্শের কথাও বলেছেন। অধ্যাপক আবুল ফজলের ভাষায়: "বলেছি তার ভাব সন্তান মুসলিম সাহিত্য সমাজের মূলমন্ত্র ছিল বুদ্ধির মুক্তি। এই বুদ্ধির মুক্তি কথাটির মধ্যেই কাজী আবদুল ওদুদের সমস্ত চিন্তাধারার বীজ নিহিত রয়েছে, তাই যেখানে যত বুদ্ধির মুক্তি মন্ত্র সাধকের পরিচয় তিনি পেয়েছেন তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেননি। গ্যাটে, রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই তাঁর শ্রদ্ধার পাত্র ও অধ্যয়নের বিষয়বস্তু। আর একই কারণে হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর নবুয়তের চাইতে তাঁর মনুষ্যত্ববোধ, শুভশক্তি ও সকল কাণ্ডজ্ঞানের তিনি বেশি ভক্ত। তাই নবী মোহাম্মদের চেয়ে মানুষ হযরত মোহাম্মদই তাঁর অধ্যয়নের বিষয়।" (সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা পৃ. ৬৭)

কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, আবুল ফজল মূলত মুসলিম সমাজের এ জাগরণ কামনা করেছেন; সেই অর্থেই রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের নব জাগরণ ও চিত্ত উত্থান কামনা করেছেন। বস্তুত একই রূপ ও কারণেই প্রতিবেশীর সমাজ ভাবনা উভয়ের রচনায় গৌন হয়ে গেছে। স্বসমাজ ও স্বজাতির কথা ভাবতে গিয়েই অনেকেই সর্বজনীন আদর্শের প্রবক্তা হতে পারেননি। এটি তাদের জন্য দুঃখজনক ও বিচিত্র হলেও অস্বাভাবিক নয়।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন : উনিশ শতকের মুসলিম রাজনৈতিক ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ধারা নিয়ে আলোচনা করেছেন মুক্তবুদ্ধি চর্চা আন্দোলনের অন্যতম প্রাণ পুরুষ আবুল কালাম শামসুদ্দীন। সাহিত্য ক্ষেত্রে

আবির্ভাবের পূর্বে তিনি সাহিত্যের তত্ত্ব কথা ও রস নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। নিজে পেশা সাংবাদিকতার জন্য এবং যুগ সম্পর্কের প্রয়োজনে বাঙালি মুসলিম মনমানস ও সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করার ফলে তাঁর সাহিত্য সৌন্দর্যেরও হানি ঘটেছে। তাঁর ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বোধ গভীর, কিন্তু সে বোধকে তিনি আধুনিক জ্ঞান ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক জিজ্ঞাসার আলোকে সাহিত্য সমন্বিত করে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করেননি। তাঁর একালের রচনায় স্বচ্ছতা, প্রত্যয় দৃঢ়তামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও ব্যাপক অধ্যয়নের কোন গভীর পরিচয় সাহিত্য সাধনায় উজ্জীবিত হয়নি। আধুনিক চিন্তা ধারার বিবর্তন সাহিত্যিক জিজ্ঞাসাকে প্রভাবিত করেছে; কিন্তু আবুল কালাম শামসুদ্দীনের রচনায় তাঁর পরিচয় স্বল্প। অথচ তাঁর প্রথম জীবনের রচনায় যে ইতিহাস, সংস্কৃতি চিন্তার রসবোধ রয়েছে, তা কালের মুসলিম লেখকের রচনায় দুর্লভ। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের রচনায় ভাষা অনাড়ম্বর, চিন্তা উদ্দীপক, কি আবেদনমুখী। স্বল্পভাষণে গভীর বক্তব্য প্রকাশে সাংবাদিক সুলভ মুন্সীয়ানা এবং স্পষ্টবাদিতা তাঁর রচনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি বাঙালির রেনেসাঁর ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার অন্যতম প্রবাদ পুরুষ।

আবুল মনসুর আহমদ: রেনেসাঁ আন্দোলন ও মুক্ত বুদ্ধি চর্চার অন্যতম প্রধান পুরুষ কথা সাহিত্যিক, রম্য লেখক, রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ। কথাশিল্পী হলেও যুক্তি ও মননশীলতায় মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি একক ও অনন্যতায় উজ্জ্বল। মুসলিম সাহিত্য ধারা অনুকরণের গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে নিজস্ব ইতিহাস ঐতিহ্য জীবন চেতনার ভিত্তিতে দাঁড় করাতে যারা চেয়েছেন তিনি তাঁদের দলে ছিলেন না। আবুল মনসুর আহমদ কথা শিল্পী হলেও যুক্তিবাদী প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নতুন যুগের সাহিত্য চেতনা, সাহিত্যে যুগ ধর্ম, বাঙালি মুসলিম জাগরণে নজরুলের ভূমিকা প্রভৃতি। সমস্যা নির্ভর সাহিত্য রচনায় আবুল মনসুর আহমদ শুধু আবেগ নয়; যুক্তিবাদীতাকে অবলম্বন করেছেন। তাঁর সাহিত্য চিন্তায় মুসলিম মনের স্বাতন্ত্র্য ও মুসলিম সাহিত্য সংস্কৃতির রূপ প্রভৃতি নিয়ে নিজস্ব ধ্যান ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ রচনায় স্বাতন্ত্র্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। একই ভৌগোলিক এলাকার অধিবাসী হয়ে ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য কীভাবে গড়ে উঠে তাঁর প্রবন্ধে গভীরভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। একই ও ভৌগোলিক পরিবেশের হয়েও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের চেতনার উপর ভিত্তি করে যে স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছে তাঁর নির্মাতা ও ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক আলোচনা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর রচনায় সাহিত্য-সংস্কৃতি জ্ঞান ও ইতিহাসবোধ বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়েছে। তবে তা যুক্তিবোধের বাইরে নয়। আবুল মনসুর আহমদের প্রবন্ধ ভাষণ ও সাহিত্য কর্মে যুক্তিবাদের প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচনায় একটি ঘরোয়া আবেগপ্রবণ পরিবেশ রয়েছে; কিন্তু তা যুক্তি দিয়ে রসগ্রাহী করে তোলা হয়েছে। তিনি আরবি ফারসি চলতি বাক্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে এক মায়াবী আবহ তৈরী করেছেন। তাঁর রচনায় আবেগের সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বক্তব্যকে আরো শানিত করেছে। বাঙালির রেনেসাঁয় তাঁর অবদান অপরিমেয়।

অধ্যাপক আবুল হোসেন: বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ও বাঙালির রেনেসাঁর অন্যতম প্রবক্তা অধ্যাপক আবুল হুসেন। সাহিত্য সমাজের অন্যতম সক্রিয় সদস্য হিসাবে তিনি বাঙালির রেনেসাঁয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে মুসলিম সমাজের কুসংস্কার ও রক্ষণশীল মনোবৃত্তির ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে ছিলো তার সাহিত্য আন্দোলন। মুক্ত বুদ্ধিবাদের প্রচারক হিসেবে জাগ্রত চেতনার জয়গান গেয়েছেন, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। বাঙালি মুসলিমের এসব জাগরণ একদিকে, অন্যদিকে বাঙালি হিন্দু-মুসলিমের জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতেও পিছপা হননি। আবুল হোসেনের আবেদন প্রধানত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির কাছে, আবেগের চেয়ে যুক্তিবাদীতাই তাঁর কাছে প্রধান। মুসলিম সমাজে মুক্ত চিন্তার চর্চা যাতে অবারিত হতে পারে সে দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। আবুল হোসেন মূলত ধর্মীয় গোঁড়ামি ও মুসলিম সমাজের পশ্চাৎপদতা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাই তার চিন্তাধারা সমাজ সমস্যা নিয়েই আবর্তিত হয়েছে। নতুন যুগ ও সমাজ প্রেক্ষাপটে মুসলিম জীবন পদ্ধতি ধর্মীয় জীবন ধারাকে নতুন যুগের পুনঃবিবেচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি।

কাজী মোতাহার হোসেন : বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা কাজী মোতাহার হোসেন। তিনি কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হোসেন প্রমুখের নীতি অনুসরণ করলেও তাঁর মানস গঠনের স্বাতন্ত্র্যটুকু স্পষ্টতর বাঙালি মুসলমানের জাগরণে ও মুসলিম সাহিত্য সমাজের সদস্য হিসেবে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। উদার ও জাতীয় চেতনার অধিকারী হয়ে তিনি মুসলিম মানসের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বিস্মৃতি হননি। মুসলিম সমাজে কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা থেকে বেরিয়ে শিক্ষার আলোক ধারায় এগিয়ে যাবে এটি তাঁর কামনা ছিল। যদিও কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে তার একটা পার্থক্য ছিল, হুমায়ুন কবিরের সাথেও কাজী মোতাহার হোসেনের একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কাজী আবদুল ওদুদের জাতীয় জাগরণ অথচ কাজী মোতাহার হোসেন ও হুমায়ুন কবিরের সাহিত্য সাধনা জাতীয় মুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপকতর ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত। তাঁরা শুধু সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা নিয়েই প্রবন্ধ রচনা করেননি বরং কাজী মোতাহার হোসেন বৈজ্ঞানিক তথ্য তত্ত্ব ও সাহিত্য তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিজ্ঞানের নিরেটতত্ত্বই শুধু নয়; বরং সাহিত্যের অনুভূতি নির্ভর রস সাহিত্যের সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। তাঁর রচনা শুধু বস্তুবাদিতা ভারাক্রান্ত নয় বরং উপলব্ধিতায় স্নিগ্ধ সাহিত্য বিচারমূলক গভীর অধ্যয়ন ও বিচার নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে। কাজী মোতাহার হোসেনের ভাষা প্রাঞ্জল সুমিত শব্দ ব্যবহার নিপুণ। গদ্যভঙ্গি ও রূপরীতিতে তিনি অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের অনুসারী। তিনি বাঙালির রেনেসাঁ আন্দোলন ও বুদ্ধির মুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

হুমায়ুন কবির : হুমায়ুন কবির একাধারে কবি ও প্রাবন্ধিক ছিলেন। কবিতায় যতটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও রোমান্টিক, ততটা বাস্তব সচেতন নন। সংস্কৃতিবাদী মনমানস তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায় না। হুমায়ুন কবির মূলত দর্শন, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য দর্শন ও রসবিচারমূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর সমাজতত্ত্বমূলক প্রবন্ধে জ্ঞান ও মনীষীর পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে। সমাজ বিচারে তিনি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকে বড় করে দেখেছেন। সাহিত্য বিচারে তিনি রসতাত্ত্বিকের চেয়ে তত্ত্ব নিষ্ঠায় পরিচয় দিয়েছেন বেশি। সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তিনি ততটা তত্ত্বনিষ্ঠ নন; যতটা আবেগ প্রবণ, বাংলা কাব্য তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। সাহিত্য সম্পর্কে, সমাজ, ধর্ম সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ রচনা করলেও সর্বত্রই তাঁর মানস দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। একদিকে নতুন যুগের চেতনা উদার মনমানস- অন্য দিকে পুরাতনের বন্ধন প্রীতি রয়েছে তাঁর রচনায়। সম্ভবতই তাঁর বহু রচনায় স্ববিরোধী চিন্তাধারা ও মতামত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তবুও তিনি বাঙালির রেনেসাঁর অন্যতম মনীষা বলে খ্যাত হয়ে আছেন।

নজরুল সাহিত্যে আন্তর্জাতিকতাবাদ

কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬খ্রি.) মূলত ১৯১৯-১৯৪২খ্রি. তাঁর সাহিত্যকাল অতিবাহিত করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্য রচনার কাল দাঁড়ায় মাত্র তেইশ বছর। প্রথম দশ বছর কবিতা, শেষ তের বছর সঙ্গীত এবং এর ভেতরে বাইরে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, অনুবাদ, সাংবাদিকতা, রাজনীতি সবই করেছেন তিনি।

নজরুলের সাহিত্য জীবনের বিচরণ মূলনীতি : প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কাল পর্যন্ত। সমকালীন বিশ্ব সাহিত্যে বিশেষ করে রবীন্দ্র যুগে তাঁর আবির্ভাব বিস্ময়কর ও ব্যতিক্রম বটে। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রথম সূর্যালোকে বাংলা সাহিত্যের সকল কবি তন্দ্রাচ্ছন্ন তখন নজরুল তাঁর অগ্নিবীণার নতুন ধারার নতুন ঝংকার তুলেছেন; আর সে সুর ঝংকারে বিমোহিত কবি কুলের নেশা ভাঙ্গলো- বৃটিশ রাজের রাজ সিংহাসন টলমল করে উঠলো। সমকালীন বিশ্বের নানা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক শোষণ নিপীড়নের পটভূমিতে তাঁর কবিতা গান ও সাহিত্যকর্ম রচিত। সমকালীন বিশ্বের নানা রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ ও টানাপোড়েন যুদ্ধবিগ্রহ, ভাঙ্গাগড়া, সংকট নজরুল সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হতে দেখা যায়। যার প্রভাব তাঁর বাঁধনহারা উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টিতে উপাদান যুগিয়েছে। সেখানে মুক্তির নেশায় পাগল প্রতি মুহূর্তে উড়ে বেড়ানোর জন্য পাখী যেন তাঁর ডানা ঝাপটাচ্ছে। যার প্রকাশ তাঁর কবিতা গান ও সাহিত্যে বিদ্রোহী রূপে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৯ দৃশ্যত অবসানের পরও বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব বিশেষ তাৎপর্যময়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের সভ্যতা এমনভাবে ধ্বংস হয়েছিল যে, তা পুনর্গঠন হতে সময় লেগেছিল। শিল্প ক্ষেত্রে বিপ্লব যুদ্ধের সাথে সাথেই আসেনি। যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই ইউরোপের যে, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চাঞ্চল্য, যা শিল্প ক্ষেত্রেও দেখা দেয়। শিল্পের এই পরিবর্তন সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ীই হয়ে থাকে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই ইংরেজ কবি এলিয়ট, ইয়েটস, এজরা পাউন্ড, রবার্ট ফ্রস্ট এর মত কবিরা আধুনিক চিন্তা চেতনা ও মনন অনুভূতির ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ফরাসি কাব্যের এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। যার ফলে ইউরোপের সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে এক নবচেতনার ধারা প্রবাহিত হতে থাকে।

বিশ্ব সাহিত্যের প্রভাবে রবীন্দ্র সমকালে যে সকল প্রবীণ কবি সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যে সামাজিক বাস্তবতাবোধের প্রয়াস চালিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে করুণানিধান বন্দোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্র মোহন বাগচি (১৮৭৭-১৯৪৮), কুমুদ রঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০), কালিদাস রায় (১৮৮৮-১৯৭৫), প্রমথ চৌধুরী (১৮৪৮-১৯৪৬), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) প্রমুখ কবিগণ অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যা সঙ্গীত (১৮৮২), প্রভাত সঙ্গীত (১৮৮৩), ছবি ও গান

(১৮৮৪), শৈশব সঙ্গীত (১৯৯৪), খেয়া (১৯০৪), গীতাঞ্জলী (১৯১০), চৈতালী (১৯১৪), বলাকা (১৯১৬) ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। যা নজরুলের কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা প্রকাশের অনেক পূর্বে প্রকাশিত। যে সকল কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রেম, প্রকৃতি, নিসর্গ ও আধ্যাত্মিক ভাবাবেশ জড়িয়ে আছে। বস্তুত বলা যায় রবীন্দ্র কাব্যে, আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর আধাত্মিকতা, দার্শনিকতা, প্রকৃতি প্রেম, নিসর্গ চেতনা এতটুকু টলাতে পারেনি; বরং মহাযুদ্ধের ভয়াবহতার মাঝেও তিনি বলাকা কাব্যে ঝড়ের খেয়া কবিতায় শান্তিসত্য, শিবসত্য, চিরন্তন এক প্রভৃতি কবিতায় দেবতার অপার মহিমা ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর নজরুল তাঁর অগ্নিবীণা কাব্যের হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ তূর্য নিয়ে। নজরুলের এই প্রেম ও যুদ্ধের ফল্গুধারা তাঁর সাহিত্যের পথে প্রান্তরে প্রবল স্রোতধারায় প্রবাহিত।

রাজনৈতিক পরাধীনতা, সামাজিক ভন্ডামী, গোঁড়ামী, রক্ষণশীলতা অর্থনৈতিক বৈষম্য শোষণ বঞ্চনা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা অনন্য সাধারণ। সর্বোপরি সকল অন্যায় অবিচার বিদ্রোহী সত্তা বাঙালির শাশ্বত চৈতন্যের সে বিদ্রোহী কবিতা শুধু একটি কবিতা নয়; একটি রাজনৈতিক সংস্থা সক্রিয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ। যা আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সঞ্চয় মিশে আছে, মিশে আছে প্রতিবাদের সংস্কৃতিতে অন্তরে বাহিরে। তাঁর অসাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ ঘটেছে ব্যক্তি জীবন থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শে। ফলে তিনি নানাভাবে লাঞ্ছিতও হয়েছেন হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির কাছে।

আধুনিক বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্র সমকালের কবিগণ স্থবিরতা থেকে মুক্তি দানের যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, সতেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্র সেন গুপ্ত অন্যতম। কিন্তু তাঁদের সে প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। নজরুলের সাথে তাদের পার্থক্য এই যে, তাঁদের বিদ্রোহ সাহিত্যের তত্ত্বগত; আর নজরুলের বিদ্রোহ গুণগত বা সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত। তাঁদের প্রতিক্রিয়া সাহিত্যের ভেতরে সীমাবদ্ধ, আর নজরুলের বিদ্রোহ সমাজ থেকে রাষ্ট্রে আর রাষ্ট্র থেকে তাঁর সাম্রাজ্যবাদের ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। নজরুল সাহিত্য জীবন থেকে স্বতন্ত্র নয়, সমাজ থেকে তুলে আনা, ফলে সমকালীন প্রেক্ষাপট তাঁর সাহিত্য সামাজিক গণমানুষের মানসিক পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি চেতনা বিকশিত হতে সহায়ক হয়েছে। এখানেই অন্যদের থেকে নজরুলের পার্থক্য সহজেই সুস্পষ্ট।

নজরুল সাহিত্যে যে বিশ্ববোধ, যে আন্তর্জাতিকতা রয়েছে তাঁর পরিচয় সে বিষয় নিয়ে সামান্য আলোকপাত করা যাক: নজরুল সাহিত্যে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সামন্তবাদী, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের নগ্ন চিত্র, মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য, শোষণ নিপীড়নের ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যেমন ধ্বনিত হয়েছে বৃটিশ উপনিবেশ থেকে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন রূপায়িত হয়েছে; ঠিক তেমনি আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহ ও তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে, এখানে তার বিশ্ববোধ ফুঁটে উঠেছে। তাঁর দৃষ্টি জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত হয়েছে। বাঙালি পল্টন ভেঙ্গে দিলে নজরুল করাচীর সেনানিবাস থেকে মার্চ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় চলে আসেন। এই সময়ে তিনি সাংবাদিকতা-কাব্য-সাহিত্য চর্চা ও সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেন। ইউরোপে সামন্তবাদের পতন হলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শাসন ধারার দ্রুত প্রসার ঘটে। এর ফলে পুঁজিবাদও দ্রুত প্রসার লাভ করে অতঃপর পুঁজিবাদের ফল দ্রুত উপনিবেশবাদ দুর্বল রাষ্ট্র ব্যবস্থার ঘাড়ে চেপে বসে। এতে করে স্বাভাবিকভাবে দেশে দেশে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন সূচিত হতে দেখা যায়। ভারতেও মুসলিম সমাজে জামাল উদ্দিন আফগানির প্যান ইসলামিজম এর জাগরণে সাড়া পড়ে যায়। বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবে ভারতীয় হিন্দুদের সাথে মুসলিম প্রভাবিত হয়েছিলেন। মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক চেতনায় তখন মুসলিম বিশ্বের সাথে একাত্মতা প্রকাশ ও ভারতে তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্পর্কে সচেতনতা লাভ। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষৌতে কংগ্রেস মুসলিম লীগের যৌথ অধিবেশন, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মন্টেস্কু চেমস ফোর্ড শাসন সংস্কার রির্পোট মুসলমান সমাজের দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় মুসলমান সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত দেশ ক্ষোভে বিক্ষোভে উত্তাল সেভার্সের সন্ধিশত প্রকাশিত হলে তুর্কী সাম্রাজ্যের অধিকাংশ গ্রিসের অন্তর্ভুক্ত হলে আরব দেশগুলোর অধিকাংশ ইংরেজ সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত হয়। ফলে ভারতে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা দ্রুত বিকাশ লাভ করে ও খেলাফত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। আর এই সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে নজরুলের অনেক রাজনৈতিক কবিতা-সাহিত্য প্রবন্ধ রচিত হতে থাকে। শুধু সাম্রাজ্যবাদী মহাজন ঘুষখোরের, শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধেও নবযুগ পত্রিকায় কবিতা প্রবন্ধ সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর গণচেতনার পরিচয় দিতে থাকেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল ডায়ারের কুকীর্তির বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখলেন– ডায়ারের মূর্তি যা ভারতবাসীকে আরো বৃটিশ শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও স্বদেশ প্রেমে উজ্জীবিত করেছে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী কবিতা রচনা করার পর নজরুল প্রবল দেশপ্রেমে ও স্বদেশিকতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে গণসাহিত্য রচনা করেছেন, তাই মূলত ভারতীয় সন্ত্রাসবাদী ও জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিমন্ত্র বা সঞ্জিবনী শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

স্বদেশী স্বাধীনতা আন্দোলন শৃঙ্খল মুক্তির ইঙ্গিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ায় শুরু হলো সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। এপ্রিল মাসের ২৩ তারিখে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের চন্দ্রগ্রাসের নেতৃত্বে বাংলার প্রাদেশিক গোপন পরিকল্পনা রচিত হয়। মাস্টার দা সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে একটি সন্ত্রাসবাদী দল গঠিত হলে তাঁরা সারাদেশে

তাঁদের সন্ত্রাসবাদী কর্মতৎপরতা ছড়িয়ে দেয়। দেশের সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে নজরুলের কবি চিত্ত আন্দোলিত হয়। তিনি একের পর কবিতা রচনা করেন: আগমনী, রক্তাম্বর ধারিণী মা, ধুমকেতু- প্রভৃতি কবিতায় দেশমাতার চণ্ডিমূর্তি কামনা করেছেন। দেশের তরুণ সমাজকে জাগাতে কবি হুগলীর জেলে বসে ১৯২৩ রচনা করেন তাঁর তরুণ জাগরণী কবিতা সেবক:

"সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,
খোদার হার জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের
দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের
সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের।" (সেবক)

এই কবিতাটিতে দেশের হতাশা নিরাশার অন্ধকার ঠেলে জাতীয় স্বার্থে তরুণ সমাজকে কবি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, ঘরে বসে থাকার সময় আর নাই, বিপ্লব আসন্ন, সুতরাং তোমাদের রক্ত দিতে, জীবন দিতে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই না দেশমাতৃকা মুক্তি পাবে, অসুরের বিনাশ হবে। তেত্রিশ কোটি মানুষের মুক্তির তরে কিছু তাজা প্রাণ উৎসর্গ করতে হবে, যারা শৃঙ্খলিত ভারতবাসীকে মুক্তি দিতে পারবে কবি তাদের দেশের সেবক বলে অভিহিত করেছেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে নজরুলের জাগৃহি কবিতায়:

"হর হর হর শংকর হর হর ব্যোম
একী ঘন রণ রোল ছায় চরাচর ব্যোম
হানে ক্ষিপ্ত মহেশ্বর রুদ্র পিনাক
ঘন প্রণব- নিনাদ হাঁকে ভৈরব-হাঁক
ধু ধু দাউ দাউ জ্বলে কোটি নর-মেধ যাগ,
হানে কাল-বিষ বিশ্বে-রে মহাকাল-নাগ।" (জাগৃহি)।

এই কবিতায় কবি হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতীকে পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে হিন্দু দেবতা শিবের প্রলয় নৃত্যের আহ্বান করেছেন, আর শংকর, ব্যোম, মহেশ্বর, নাগ, চামুন্ডা, বৈশ্বানর, বিষ্ণু, অসুর, গৌরি, লক্ষ্মী, কমলা, রাণী, ভারতী, প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর রূপক উত্থান কামনা করে ভারতের সমকালীন জাতীয় জাগরণ প্রত্যাশা করেছেন।

মূলত বিষের বাঁশি কাব্যগ্রন্থের আত্মশক্তি, মরণ বরণ, বন্দীর বন্দনা, বন্দনা গান প্রভৃতি কবিতায় কবির স্বদেশ মুক্তির আকুলতা, জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে মরণ ভয়কে দুপায়ে ঠেলে বন্দীর জীবন, কারা নির্যাতন ও মুক্তি কামী গণ মানুষের বিজয় কামনা করা হয়েছে।

বন্দীর বন্দনা গানটি সমকালীন যে চিত্র তাতেও গান জাগরণের সুর ধ্বনিত হয়েছে:

"আজ রক্ত নিশি-ভোরে
একী শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে,
কাহারো কারাবাসে
মুক্তি-হাসি হাসে
টুটেছে ভয় বাঁধা স্বাধীন হিয়া
তলে বন্দীর বন্দন, বিষের বাঁশি।"

উল্লেখ্য যে, বন্দীর বন্দনা খেলাফত আন্দোলনের নেতা মৌলানা শওকত আলী ও মৌলানা মোহাম্মদ আলী ভাতৃদ্বয়কে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গ্রেপ্তার ও ১ নভেম্বর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে করাচিতে বিচারে বৃটিশ সরকার রাজদ্রোহের অপরাধে দু' বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আলী ভাতৃদ্বয়ের এই কারাদন্ডকে উপলক্ষ করে নজরুল বন্দীর বন্দনা গান রচনা করে রাজবন্দীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বলেছেন। এই বন্দীর জীবন যে ব্যর্থ নয়; তা যে এক মহৎ আদর্শ দেশ মাতৃকার প্রতি ত্যাগ স্বীকারের কারা নিপীড়ন, জুলুম অত্যাচার, লাঞ্ছনা গঞ্জনাকে কবি হাস্যকর ও বিদ্রুপ স্বরূপ তাকে ছল বলেছেন, কারণ এই কারা নির্যাতনের পরই স্বপ্নের মুক্তি ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আসবে। তাই নজরুল তাঁর 'শিকল পরার গান' কবিতায় বলেছেন:

"এই শিকল পরা ছল মোদের শিকল পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।" (শিকল পরার গান)

এখানে ভারতীয় জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে এই শিকল পরা একটি কৌশল হিসাবে কবি বর্ণনা করেছেন, সকল নিপীড়ন নির্যাতন বন্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে আহ্বান জানানো হয়েছে। গীতি কবিতাটিতে এক বিশেষ সামাজিক রাজনৈতিক মুক্তির উপায় হিসেবে গণমানুষের রুখে দাঁড়াবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। স্বাধীনতার দাবী নজরুল সবার পূর্বে ভাষায় প্রথম উচ্চারণ করেন। তাঁর মত করে কোন স্বদেশী নেতা, কোন কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীও করেননি। সাপ্তাহিক ধূমকেতু পত্রিকায় তাঁর স্বাধীনতার দাবীটি এমন:

"স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথি এক এক রকম করেন। ভারতবর্ষের এক এক পরমাণু অংশও বিদেশির অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশির মোড়লী করার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছেন, তাদের পাততরি গুটিয়ে বোঁচকা পুঁটলী বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা আবেদন নিবেদন করলে তারা শুনবেন; তাদের এতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু দূর করতে হবে।"

(সাপ্তাহিক ধূমকেতু ১৩ সংখ্যা-১৩ অক্টোবর-১৯২২ কোলকাতা)।

এই প্রবন্ধ ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশ, অগ্নিবীণা কাব্য বিষের বাঁশি কাব্য প্রলয় শিখা, ফণিমনসা কাব্য, সাম্যবাদী রাজবন্দীর জবানবন্দীসহ প্রায় ডজন খানেক গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত; রাজদ্রোহের অপরাধে নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি,

ধূমকেতু পত্রিকা অফিস সিলগালা, পত্রিকা জব্দ এবং কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের সাহিত্য কর্ম বাজেয়াপ্ত; তাঁকে গ্রেপ্তার, তাঁর দু'বছরের কারাদন্ড এক ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথা গণমানুষের সার্বিক মুক্তির স্বার্থে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। জাতীয় গণজাগরণই শুধু নয়, আন্তর্জাতিক পরিসর নিয়েও তাঁর ভাবনার অবকাশ কম ছিল না। তাঁর সাহিত্য কর্মের দিকে তাকালেও সে বিষয়ে সম্যক ধারণা পাওয় যায়। নজরুলের আন্তর্জাতিক বোধ কতটা সচেতন তা তাঁর বিংশ শতাব্দী কবিতায় স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠেছে। নবচেতনা, নতুন ধ্যান ধারণা, নব প্রেরণায় উচ্চারিত হয়েছে, যেমন সকল বন্ধনে মুক্তির, সকল ভয় মুক্তির, পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির, সকল মানুষকে বন্ধন ছিন্ন করে একদেহ একমন নিখিল মানবজাতির একজাতিতে পরিণত করার মহান স্বপ্ন দেখেছেন:

"পুবে পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে
যুরোপ, রাশিয়া, আরব, মিশর, চীন
আমরা আজিকে এক-প্রাণ এক-দেহ।
একবাণী 'কারো অধীন রবে না কেহ
চলি একে একে দৈত্য-প্রাসাদ জিনে
পারি নাই যাহা, পারিব দু-এক দিনে।
কাটায়ে উঠেছি ধর্ম আফিম নেশা
ধ্বংস করেছি ধর্মযাজকী পেশা
ভাঙি মন্দির, ভাঙি মসজিদ
ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত
এক মানবের একই রক্ত মেশা
কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেষা।" (বিংশ শতাব্দী)

মানুষ কবিতায় কবি মোল্লা-পুরোহিত কর্তৃক ভজনালয়ের তালা ভেঙ্গে অধিকার প্রতিষ্ঠায় চেঙ্গিস খানের মত, গজনীর সুলতান মাহমুদ, কালা পাহাড়ের মত শক্তির উত্থান কামনা করে মানবতা ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। আর বিংশ শতাব্দী কবিতায় কবি মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী ধর্ম আফিম নেশা কাটিয়ে এক মানব জাতির পৃথিবী নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন। নজরুলের বিশ্বজনীনতার রূপ বর্ণনা করতে গেলে তাঁর কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ চিঠিপত্র এবং অভিভাষণের অনুসন্ধান জরুরী।

নজরুল বলেন: "আমি এই দেশে, এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই নই, সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের। --- যারা আমার নামে অভিযোগ করেন, তাদের মত হলুমনা বলে– তাদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তারা যেন সকলের করে দেখেন। কেউ বলেন আমার বানী যবন, কেউ বলেন কাফির। আমি বলি ও দু'টোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।" নজরুলের বিশ্ববোধ বা বিশ্বজনিতা কতটা উদার ও মানবিকতায় ভরা তা সহজেই উপলব্ধি করার বিষয়। কবি তার সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থে মানুষ কবিতায় কষ্টে অথচ বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণ করেছেন মানুষের জয়গান, সেখানে দেশ কাল, পাত্র মিত্র ভেদাভেদের কোন স্থান নাই। কবি বলেন:

"গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশকাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি।"
(মানুষ, সাম্যবাদী)

এখানেও তার ভেদহীন পাত্রমিত্রহীন এক মহীয়ান গরিয়ান মানব জাতির জয়গান গেয়েছেন, যে সেই মানব জাতিকে মহীয়ান- গরিয়ান বলেছেন, যে সাম্য সকল মানুষকে এক কাতারে সমবেত করবে, সমান মর্যাদা দেবে, সেই সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্নে তিনি বিভোর। নজরুল দশম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। করাচীর নোসেরাতে তার কর্মস্থল। মূলত করাচীর সৈনিক জীবনেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার প্রথম সূত্রপাত ঘটে। ঐ সময়ে তিনি ফারসি কবি হাফিজের দিওয়ানই এ হাফিজ রুবাইৎ-ই-ওমর খৈয়াম রুমী, জামী ইকবাল ও রুশ সাহিত্য, রুশ বিপ্লব আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্বের ভাঙ্গন, গড়া প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করেন। সৈনিক জীবনেই তাঁর চোখের সামনে বিশ্ব সাহিত্যের সকল দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তাছাড়া দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি ধারার সময় বলা যেতে পারে।

সৈনিক জীবনেই নজরুল তাঁর পত্র উপন্যাস 'বাঁধনহারা' রচনা করেন, বাংলা ভাষায় পত্র উপন্যাস বলা যায়। লেলিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লব, তুরস্কে মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে তুর্কী বিপ্লব, আইরিশ বিদ্রোহ, চীনে সানিয়াত সেনের নেতৃত্বে, পরে মাওসেতুং এর নেতৃত্ব গণবিপ্লব সমগ্র পৃথিবীতে নবচেতনা ও নব সৃষ্টির উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে। বৃটিশ শাসিত ভারতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ চিন্তাধারা বাঙালির জীবনে নবজাগরণ ও জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা জাগাতে সক্ষম হয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে স্বদেশ, অসহযোগ, সন্ত্রাসবাদী বিভিন্ন আন্দোলন প্রবল প্রবাহ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা ভাষার কবি সাহিত্যিকগণ তখন পৃথিবীর যুদ্ধের ফলে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে হতাশার তিমিরে আচ্ছন্ন হয়েছেন। যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, আর সৃষ্টির নব প্রবাহকে যারা বড় করে দেখেছেন সেই সাথে পৃথিবীতে স্বদেশের সৃষ্টির অপার সম্ভাবনা দেখেছেন। নজরুল ছিলেন মহৎ সম্ভাবনার বলিষ্ঠ প্রতিনিধি। সমকালের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের আবেগ-অনুভূতি নজরুল কাব্যে, প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, তাঁর হাতটা উঠে এসেছে, তা বাংলা ভাষার অপরাপর কবি লেখকের রচনায় লক্ষ্য করা যায় না। নজরুলের আন্তর্জাতিক মানস এ পটভূমিতে বিচার

বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। পল্টনের সৈনিক জীবন তাঁর সামনে বিশ্ব মানবতার অপার দিগন্ত উন্মোচন করেছিল; যা তাঁর পরবর্তী সাহিত্য সঙ্গীত জীবনে মনমানস সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।
নজরুলের বিশ্ববোধ, বিশ্ব মানবতা, উদারতা, চোখের সামনে সকল নীচতা, হীনতা, ভেদাভেদ, ধর্মীয় গোঁড়ামী, কুসংস্কার, সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও সামাজিক সাম্যবাদ বিষয়ে ব্যাপক ধারণা ও জ্ঞান লাভ করেন। শুধু তাই নয়; সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের গণ্ডি থেকে বাইরে এসে নব ধারার চেতনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেন। রবীন্দ্রনাথের মত নজরুল ইসলামও ক্রমশ ব্যাপক উদারতার সীমানায় মানব মুক্তির সন্ধান করেছিলেন। ড. আনিসুজ্জামান মনে করেন: 'ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ভ্রমণই রবীন্দ্রনাথকে ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা ও জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে উঠতে শিখিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ দিকে ধর্ম ও জাতীয়তাবাদে তেমন আস্থা রাখতে পারেননি। এক সময় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ধর্ম মানুষকে মেলায়, তেমনি ধর্ম মানুষকে বিভক্তও করে। এজন্য রবীন্দ্রনাথ জীবনের একটি পর্বে দায়ী করেছেন ধর্মতন্ত্রকে। তিনি বলেছেন: 'ধর্ম মানুষকে মেলায়, কিন্তু ধর্মতন্ত্র মানুষকে অশ্রদ্ধা করতে শেখায়, মানুষকে বিভক্ত করে দেয়। তারপরে রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারা আবার পরিবর্তন হয়েছে।'... রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে ইউরোপ ভ্রমণে গেলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে: তিনি দেখলেন জাতীয়তাবাদী চেতনা এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরেক রাষ্ট্রে হাত তুলতে শেখাচ্ছে। তখন তিনি দেশপ্রেমকে ভাল বলেছেন কিন্তু জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দোষ দিয়েছেন, এর নিন্দা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "যে জাতীয়তাবাদী চেতনা মানুষকে বিভক্ত করে, পৃথিবীর নাগরিক হিসাবে চিন্তা করতে দেয় না, কাজেই জাতীয়তাবাদের পক্ষ ঠিক নয়, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেয় না, মানুষকে ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংকীর্ণ চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে।" (জাপান ভ্রমণ-রবীন্দ্রনাথ)।
নজরুলের আন্তর্জাতিকতা ছড়িয়ে আছে অসংখ্য কবিতায়: মরক্কোর স্বাধীনতার বীর সেনানী রীফ সর্দার (আশ্বিন-১৩৩৫) আব্দুল করিমের প্রীতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনমূলক কবিতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মরক্কোর অধিকাংশ ফরাসি ও কিয়দংশ স্পেনের দখলে থাকে। পাশ্চাত্য ঔপনিবেশের বিরুদ্ধে স্পেনের দখলে থাকে। ১৯২১-১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ বিদ্রোহ দমনে ফ্রান্স ও স্পেন সম্মিলিত ভাবে রীফ নেতা আব্দুল করিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে রীফ উপজাতির বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। রীফ উপজাতিকে একত্র করে আব্দুল করিম ঔপনিবেশিক ও স্পেনীয় বাহিনীকে মরক্কোর উত্তর অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেন। পরে রীফ নেতা আব্দুল করিম ফরাসি বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করলে ফরাসি বাহিনী ভীত হয়ে স্পেনের সহযোগিতায় যৌথভাবে মোকাবেলা করে। আব্দুল করিম স্পেনীয় ও ফরাসি বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ পরিচালান করেন এবং তাকে দুই শক্তি ঔপনিবেশিক শক্তি পরাজিত করতে পারেনি। মরক্কোর সেই জাতীয় বীর রীফ সর্দারের শৌর্যবীর্য ও সাহসের জন্য নজরুল তাকে নব যুগের নেপোলিয়ান বলে অভিহিত করেছেন।

"শয়তানী ছল ফেরেববাজ
ভুলাল দেশদ্রোহীর মন
অর্থ তাদের করিল জয়
অস্ত্রে যাহারা চিনিল রণ।" (রীফ সর্দার)

আবার খেলাফত বিলুপ্ত ঘোষণা করে তুর্কীবীর যোদ্ধা কামাল পাশা আধুনিক তুরস্কের জনক হয়ে মুসলিম বিশ্বের গৌরব বাড়িয়ে দেন, তিনি পর্দা প্রথা বাতিল, নারীর শিক্ষা বাধ্যতামূলক, নারীর কর্ম বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেন। পরে তুর্কী পার্লামেন্টে তাকে সর্বসম্মতিক্রমে গাজী উপাধিতে ভূষিত করেন। আবার মুসলিম বিশ্বের অধঃপতন দেখে নজরুল দুঃখিত ও ব্যথিত হয়ে আফসোস করে লিখলেন মিশরের আনোয়ার পাশাকে নিয়ে বিখ্যাত কবিতা। আনোয়ার, কামাল পাশা, শাত-ইল আরব, খেয়াপাড়ের তরণী, কোরবাণী প্রভৃতি কবিতায় বিশ্বজনীনতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এই কবিতাগুলোতে মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস ঐতিহ্য ঘটনা চরিত্র সাহিত্য নানা রূপক প্রতীকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আবার তেমনি প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বর ধারিণী মা, আগমনী, ধুমকেতু কবিতায় কবি প্রাচীন ভারতের হিন্দু ধর্মীয় ইতিহাস ঐতিহ্য হিন্দু ধর্মীয় নানা রূপক প্রতীকের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্যের কামনা করেছেন।
নজরুল মূলত মহৎ মানবতাবাদী সাহিত্য স্রষ্টা, তাই ধর্মীয় অনুশাসন ও জাতীয়তাবাদী চেতনা তাকে সংকীর্ণ গণ্ডিতে আটকে রাখতে পারেনি। বিশ্ব মানবতার দিকেই তার পথ চলা, এ কারণেই তিনি পৃথিবীর সকল মানুষকে এক ও সমতার দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন; আর সমগ্র পৃথিবীকে একটি দেশ ভাবতে শিখেছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন বিশ্ব নাগরিক। নজরুল নিজেই বলেছেন:
"দেয়ালের পর দেয়াল তুলে আমরা ভেদবিভেদের জিন্দানখানা সৃষ্টি করেছি। কত নাম শিয়া-সুন্নী শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, হানাফী, শাফী, মালেকী, হাম্বল লামাজহাবী ওজাবী প্রভৃতি কত শত দল। এই শত দলকে একটি বোঁটায়, একটি মৃণালের বন্ধনে বাঁধতে পারো তোমরাই। শতধা বিচ্ছিন্ন এই শতদলকে একশামিল করো, এক জামাত করো, সকল ভেদ বিভেদের প্রাচীর নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙ্গে ফেলো।" নজরুল কোথা থেকে এই সকল কথা বলার অদম্য শক্তি অর্জন করেছিলেন? অনেক পথই তাকে আলোকিত করেছিলো, একদিকে রবীন্দ্রনাথ, নেগুচি, ইয়েট্স, গোর্কি, টলস্টয়, কিট্স যোহান বোধার, শেলি, জর্জ বার্নার্ড, মার্কস, ইকবাল, ওমর খৈয়ম, শেখ সাদী, হাফিজ, রুমী, জামী প্রমুখ বিশ্ব বরেণ্য লোকবৃন্দ।
রবীন্দ্রনাথসহ বিশ্ব বরেণ্য লেখকদের লেখনী পাঠ করেই নজরুল উদার মনুষত্ব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের করাচীর সৈনিক জীবন যে বিশ্ব সাহিত্যের অপার জগৎ তার সামনে মেলে ধরেছিলো তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের

অবকাশ নেই। "১৯১৭ সাল আমি সবে মাত্র দশম শ্রেণির ছাত্র, স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। মহা কবি হাফিজের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। বাঙালি পল্টনে এক পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব দিওয়ানই হাফিজের কতকগুলো কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই, সেদিন থেকেই তাঁর কাছে, ফারসি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি, তাঁর কাছেই সমস্ত ফারসী কবিদের বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।" রবীন্দ্রনাথ, ওমর খৈয়াম, হাফিজ, জামী, রুমী ও ইকবাল দর্শনও তাকে আকৃষ্ট করেছে; তবে, সবচেয়ে বেশি নজরুল ওমর খৈয়ামের কাব্য ও জীবন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন, নজরুলের ধর্ম বিরোধী চেতনার কাব্য ওমর খৈয়ামের স্পষ্ট প্রভাব। তবে ধর্মীয় গোঁড়ামী ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ উচ্চারণ বাঙালির মন ও মানস গঠনে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে, এক রেনেসাঁসের জন্ম দিয়েছে। তাঁর সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থে যার অসংখ্য নজির দেখা যায়। আর এ কারণেই ওমর খৈয়ামের দর্শন নজরুলকে মুগ্ধ করেছে, আবেগ আপ্লুত করেছে এবং পরিপূর্ণ জীবনবোধে সার্থকতা দিয়েছে।

ওমর খৈয়াম শুধু এক পারসি সাহিত্য স্রষ্টাই নন; তিনি এক মহান দার্শনিক। জীবন ও জগৎ সংসার সম্পর্কে তার অভিমত হলো: "সব মিথ্যা, পৃথিবী মিথ্যা, স্বর্গ মিথ্যা, পাপ-পুণ্য মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, আমি মিথ্যা, সত্য মিথ্যা, মিথ্যাও মিথ্যা। একমাত্র সত্য হলো যে মুহূর্ত (সময়) তোমার হাতের মুঠোয়। এসো তাকে চুটিয়ে ভোগ করে নাও। স্রষ্টা যদি কেউ থাকেনও তিনি আমাদের সুখে দুঃখে। আমরা তাঁর হাতের খেলার পুতুল। সৃষ্টি করেছেন, ভাঙ্গছেন তার খেয়াল মত, তুমি কাঁদলে যা হবে, না কাদলেও তাই হবে, যা হবার তা হবেই। যে মরে গেল সে একেবারেই মরে গেল, সে আর আসবেও না, বাঁচবে না। তার পাপ- স্রষ্টারই আদেশে– তাঁর খেলা জমাবার জন্য। মোট কথা স্রষ্টা একটা বিরাট খেয়ালী শিশু বা ঐন্দ্রজালিক।" কাজেই দার্শনিক ওমর খৈয়ামের প্রভাব স্পষ্টত নজরুলের চিন্তা ও মানস ভূমিকে বিকশিত করেছে। তাই তাকে বলতে শোনা যায়, "আমাদের এ বিশ্বাসী মন জিজ্ঞাসা করে উঠে, কেন এই জীবন, মৃত্যুই বা কেন? স্বর্গ নরক, ভগবান বলে সত্যই কি কিছু আছে? আমরা মরে কোথায় যাই? কেন এই হানাহানি, এই অভাব দুঃখ শোক? এমনিতর অগণিত প্রশ্ন, যার উত্তর কেউ দিতে পারেনি। যে উত্তর দিয়েছে সে তার উত্তরের প্রমাণে কিছুই দেখাতে পারেনি; শুধু বলেছে বিশ্বাস করো। তবুও আমাদের মন বিশ্বাস করতে চায় না, সে তর্ক করতে শিখেছে। এই প্রশ্নের হাত এড়াবার জন্য কত অবতার-পয়গম্বর এলেন, তবুও যে প্রশ্ন সে প্রশ্নই রয়ে গেল। মানুষের দুঃখ এক তিলও কমল না।" নজরুল এভাবেই মহাকবি ওমর খৈয়ামের দর্শনের অপার জগতে অবগাহন করেছেন।

মূলত নজরুল বিশ্ব সাহিত্যের প্রায় সকল বিখ্যাত লেখকের রচনাই পাঠ করেছিলেন। ইয়েটস, শেলী, কিটস, বায়বন, বার্নাড'শ, পুশিকন, গোর্কি, টলস্টয়, শেখর, আনাতোল ফ্রান্স, এমিলি জোলা, ফ্রয়েড হুইটম্যান, কার্ল মার্কসসহ বহু মনীষীদের। ফলে বৃহত্তর উদার মানবিক মানস তার ভিতরে বিকাশ লাভ করে। সমকালীন বিশ্ব নেতৃত্ব তুরস্কের কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, মহামতি লেনিন, যিনি কার্ল মার্কসের রাজনৈতিক দর্শনকে সমাজ বিপ্লবে রূপ দিয়েছিলেন। চীনের সানিয়াত সেনের পরে মহামতি মাওসেতুং এর নেতৃত্ব তাকে সমানভাবে সমাজবিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর নজরুল বিশ্ব সাহিত্যের সেই পরিবর্তনশীল ধারণাকে তাঁর সাহিত্যের বিষয়ভুক্ত করেছিলেন। এভাবেই তার হৃদয়মন বিশ্বলোকে আলোকিত হয়ে উঠে। সেই সঙ্গে সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে নজরুলের নতুন ধারণা বাণী রূপ পায়। নজরুল বলেন, "যাহা বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পায় না, তাহা স্থায়ী সাহিত্য নয়, খুব জোর দু'দিন আদর লাভের পর তাহার মৃত্যু হয়। আমাদিগকে এখন তাই করিতে হইবে, সাহিত্যের সার্বজনীনতা সৃষ্টি। অবশ্য নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়াইয়া, না হারাইয়া। যিনি যে দেশরই হউন, সকলের অন্তরের কতকগুলো সত্য আছে, সূক্ষ্মতম ভাব আছে যাহা সকল দেশের সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমার কেবলই যেন মনে হতো– আমি মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছি। জাতি ধর্মভেদ আমার কোন দিনও ছিল না, আজো নেই।" একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় নজরুলের মধ্যে একটি বিশ্ববোধ ও বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত গড়ে উঠেছিল। একটি বিশ্ব মানবিক চেতনার মন-মানসের উন্মেষ ঘটেছিল। নজরুলের টুংরির পাঞ্জাবী ওস্তাদ জমির উদ্দিন খাঁর মৃত্যুর পর নজরুল তাকে নিয়ে নিবন্ধ রচনা করেন ওস্তাদ জমির উদ্দিন খান' তাতে লিখলেন: "আমি বলি; গানের পাখি উড়ে বেড়ায়, নীড় বাঁধে না। কোকিল পাহাড়ে থাকে সে আসে বসন্তকালে, তার গান আমাদের মুগ্ধ করে। তারপর গান গাইয়া হলে আবার সে চলে যায়। সুরের আবেদন সমানভাবে সকল মানুষের অন্তর স্পর্শ করে। জমির উদ্দিন খান পাঞ্জাবী ছিলেন সত্য; কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে। নজরুল আজীবন মহৎ ও মনীষীদের সংস্পর্শে আরো মহত্তম আদর্শে মনুষত্ব অর্জনের সাধক ছিলেন। তাই তো দেখা যায়, কোলকাতা মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে ছাত্র সম্মিলনে দ্বিতীয় অধিবেশনে বলেন: "আমি সর্ববন্ধন মুক্ত, সর্বসংস্কার মুক্ত, সর্বভেদাভেদ ও জ্ঞান মুক্ত না হলে, সেই পরম নিরাবরণ, পরম মুক্ত আল্লাহকে পাবো না আমার শক্তিতে।" এমন কথা একমাত্র নজরুলের পক্ষেই বলা সম্ভব। (১৯৪০ খ্রি. ২৩ ডিসেম্বর, কোলকাতা, মুসলিম ছাত্র সম্মিলন) নজরুলের বিশ্ববোধ ও বিশ্বপ্রেমের অসংখ্য নজির দেখানো যাবে কোলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে মুসলিম সাহিত্য সমিতির রজত জুবিলী উৎসবে সভাপতির ভাষণে নজরুল তার জীবনের শেষ অভিভাষণে বলেন: "হিন্দু মুসলমানের দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তূপের মত জমা হয়ে আছে। এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম, আমাকে কেবল মুসলমান বলে দেখবেন না, যদি আসি, আসবো হিন্দু মুসলমানের, সকল জাতির উর্ধ্বে যিনি একমেরা দ্বিতীয়াম তারই দাস হয়ে।" (৫ ও ৬ এপ্রিল-১৯৪১ কোলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট)। তারপরেও কি বলতে হবে নজরুলের বিশ্বপ্রেম,

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, কিংবা চেতনা কতটা সুদূরপ্রসারী। নজরুলের এই অভিভাষণ, পরবর্তী কালে "যদি আর বাঁশি না বাজে" শিরোনামে সর্বত্রই পরিচিতি লাভ করে। নজরুল আরো বলেন: "আমি শুধু অসাম্য আর মানুষে মানুষে ভেদ জ্ঞান দূর করতেই আসিনি; আমি প্রেম দিতেও এসেছিলাম।" (নজরুলের অভিভাষণ মুসলিম সাহিত্য-সমিতির যুবিলী উৎসব-১৯৪১) ড. আহমদ শরীফ বলেছেন: মানব ধর্ম ও ব্যক্তি নিষ্ঠা। কাজেই নজরুলের প্রেমধর্ম, তাকে বিশ্বপ্রেমিক করে তুলেছে। প্রেমেও নজরুলের আন্তরজাতিকতার স্পর্শ ও গন্ধ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

নজরুল আরো বলেছেন:

"যার ইচ্ছায় আজ দেহের মাঝে দেহাতীতের নিত্য মধুর রূপ দর্শন করেছি, তিনি যদি আমার সব অস্তিত্ব গ্রহণ করে আমার আনন্দময়ী প্রেমময়ী শক্তিকে ফিরিয়ে দেন–তাহলে আমি এই বিদ্বেষ জর্জরিত কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতা ভেদ জ্ঞান কলুষিত অসুন্দর অসুর নিপীড়িত পৃথিবীতে সুন্দর করে যাবো; এই তৃষিতা পৃথিবী বহুকাল যে প্রেম আমৃত্যু, সে আনন্দ সুধা থেকে বঞ্চিত; সেই আনন্দ সেই প্রেম সে আবার পাবে। আমি হব উপলক্ষ মাত্র, আঁধার মাত্র, সেই সাম্য, সেই অভেদ, শান্তি, আনন্দ আমার নিত্য পরম সুন্দর পরম প্রেমময়ের কাছ থেকে, যদি আর বাঁশি না বাজে–আমি কবি বলে বলছিনে, আমি আপনাদের ভালবাসা পেয়েছিলাম, সেই অধিকারেই বলছি–আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন, ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি, আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে বসেছিলাম।" (যদি আর বাঁশি না বাজে- মুসলিম সাহিত্য সমিতিতে সভাপতির অভিভাষণে-১৯৪১)।

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন:

"এখানে নজরুল সত্যিকার বিদ্রোহী এবং মানবতাবাদী। সে বিদ্রোহ প্রকাশ তরল বাষ্পীয় উল্লাসে নয়; মানুষের মূল্য ও মহিমা সম্পর্কে অটল ধ্রুব কবি বিশ্বাসের নির্ভীক স্বীকারোক্তি।

বস্তুত নজরুলের বিদ্রোহ গভীর উপলব্ধিজাত স্পষ্ট উচ্চারণ; যা অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাই নজরুল দৃঢ়তার সাথে বলেন: "আমি মুসলমান; কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির।"

তিনি যে সকল দেশের, সকল মানুষকে একজাতি–এক সমতার ভিত্তিতে দেখেছেন, তার অসংখ্য প্রমাণ দেয়া যাবে। যথা:

"বন্ধু, বলিনি ঝুট –
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়েই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধগয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা ভবন।
মসজিদ এই, মন্দির এই, গীর্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেলো সত্যের পরিচয়।" (সাম্যবাদী)

যে মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায়, যে ধর্ম মানুষকে আঘাত করতে শেখায়, মানুষে মানুষে বৈষম্যের দেয়াল সৃষ্টি করে, বিভেদ সৃষ্টি করে, করতে শেখায়, সে ধর্ম ধর্মই নয়, সে মানুষ হতে পারে না, মানুষরূপী দানব। নজরুলের ভাষায়: "গাহি সাম্যের গান। মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।" (মানুষ-সাম্যবাদী)

নজরুলের আন্তর্জাতিকতা তাঁর গল্প-উপন্যাস কবিতার বিশ্ববোধ, বিশ্বপ্রেম নানা ভাষায়, নানা আঙ্গিকে ছড়িয়ে রয়েছে, রয়েছে তাঁর উদার মানবিকতা, তিনি প্রথম সামাজিক সাম্যবাদের কথা বাংলা কবিতায় তুলে ধরেন।

বস্তুত বিশ্ব মানবতাবাদের ও সাম্যবাদের কবি বলেই তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদ অনুসারী। আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সর্বকালের সর্বজাতির, তাঁর অভিভাষণ, প্রবন্ধ, কবিতা, চিঠিপত্র ইত্যাদিতে তার পরিচয় সুস্পষ্ট। নজরুলের সৃষ্টি বহুমাত্রিকতায় আন্তর্জাতিক সীমারেখাকে অতি সহজেই স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছেন।

নজরুলের রেনেসাঁয় তাঁর বৈশ্বিক আবেদনের, তাঁর কবিতা-গান-প্রবন্ধ-গল্প উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে, এক্ষেত্রে নজরুলের বিশ্ব বোধ ও চেতনায় ভাস্বর হয়ে আছেন একক মহিমা নিয়ে।

বাঙালি রেনেসাঁয় নজরুল সাহিত্য

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১খ্রি.)। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান উৎকর্ষের, বিকাশের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছে। বাঙালি জাতিসত্তা নির্মাণেও তাঁর ভূমিকা অগ্রণী। যদিও রাজনৈতিক চেতনা, সামাজিক চেতনা, অপরাপর জাতি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারা নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকতেই পারে। ভুলে গেলে চলবে না, তিনিও মানুষ। রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে নানা কথা থাকতে পারে। তাঁর রাজনৈতিক চেতনায় হিন্দু জাতীয়তাবাদী একটি মানসিকতা সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে। যেমন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এর বিরোধিতা (১৯২১), বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) বিরোধিতা, বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১) আন্দোলনে অংশগ্রহণ, কলিকাতা গড়ের মাঠে সভাপতিত্ব করা, হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা শিবাজীকে নিয়ে কবিতা রচনা প্রভৃতি অন্যতম। মুসলিম কোন বীর যোদ্ধাকে নিয়ে প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা তিনি করেননি। তাঁর কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি, প্রার্থনা, নিসর্গের রূপ বর্ণনা ও দার্শনিকতায় ভরা সত্য; তাঁর কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। তাঁর কবিতায় ভরা শান্ত দীঘির বুকে পদ্ম ফুলের সৌরভ যেমন আছে, তেমনি তাঁর রূপের অপরূপ মাধুরীও আছে; যা সৌন্দর্য পিপাসু, মননশীল পাঠককে যাদুময় স্পর্শে মোহাবিষ্ট করে রাখে। একথা বলতেই হবে রবীন্দ্রনাথ নির্ভেজাল সাহিত্য প্রেমীর এক জরুরী পাঠক। তাকে পাঠ না করলে সাহিত্যের বোদ্ধা রসিক পাঠক হওয়া যাবে না। তাই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা, সামাজিক চেতনা এমন কি জাতিগত চেতনা যাই থাকুক, সাহিত্য শিল্পের অন্তর্লোকে স্পর্শ করতে চাইলে রবীন্দ্র পাঠ আবশ্যকীয় বলতেই হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাঙালির মানস লোক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা, উদার অসাম্প্রদায়িক চেতনার ক্ষেত্রে কি অবদান রেখেছেন তা বিরাট একটি প্রশ্নবোধক! আমার লেখা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নয়; বরং নজরুলের সাহিত্যে সমাজ বিপ্লব বা ধর্মগত চেতনাধিকার বাঙালির অন্তরলোক স্পর্শ করে তাকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করে তার দেহ মনে নতুন প্রাণের সঞ্জিবনী সুধা ঢেলে নির্জীব বাঙালির প্রাণ সঞ্চার করেছেন, বলাই আজকের এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে নজরুলের রাজনীতি :

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬খ্রি.) বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরাধীন বৃটিশ ভারতে তাঁর জন্ম এটি তাঁর আত্মমর্যাদার গ্লানিকর ও বৃশ্চিক জ্বালায় তাড়িত করেছে। বৃটিশ বাংলার শাসন ক্ষমতায় বৃটিশের প্রতিনিধি তাঁদের শাসন, শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন এক বিভীষিকাময় পরিবেশ তৈরি করেছিল। ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। নজরুল নিজে শুধু বৃটিশ সরকারের শাসনের অবসান কামনাই করেননি, তাদের বোচঁকা পুটলী বেঁধে চলে যেতেও বলেছেন স্পষ্ট ভাষায়। তিনিই প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। যা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। নজরুল বলেন: "স্বরাজ টরাজ বুঝি না, ও কথাটার মানে এক এক মহারথি একেক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশির মোড়লীর অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছেন, তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে বোঁচকা পুটলী বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তারা শুনবেন না। তাদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা ও ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু দূর করতে হবে। কবি ও সমালোচক আব্দুল কাদির বলেন: "উপমহাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা এহেন অকুতোভয় ঘোষণার বাণী বাংলাদেশের এই মহাকবির দৃপ্ত করেই সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছিল।" যদিও তাঁর এই প্রথম স্বাধীনতার দাবী কোন রাজনৈতিক দলের নয়; কিন্তু সকল দলের, সকল মানুষের, তাই এই দাবীকে ভারতের সকল দল ও মানুষ নির্বিশেষে সমর্থন জানাতে কোন রূপ দ্বিধা করেননি। এই যে নিজের চিন্তায় মননের জোরে, যে দাবী কংগ্রেস-মুসলিম লীগ বা জাতীয়তাবাদী কোন দল ভারতবর্ষে উত্থাপন করেনি নজরুল তাই করলেন। এখানেই তার মুক্ত চিন্তা বা চর্চার পরিচয় প্রথম আমরা পাই। প্রচলিত আচার রীতি প্রথার নামে, ধর্মের নামে শিক্ষার নামে হিন্দু মুসলিম সমাজে যে অনাচার তার বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন রীতিমত কলম যোদ্ধা হিসাবে। শুধু তাই নয় নজরুল তাঁর লেখনী দিয়ে রেনেসাঁসের অবতারণা করলেও সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতিও তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন সমানভাবে। তবে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের চেতনার থেকে সাহিত্যিক ভূমিকা অধিকতর কার্যকরী অবদান রেখেছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের পাকিস্তান প্রবারের বিপ্লবী আইডিয়া ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠী জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলো। কবি ইকবালের রাষ্ট্রনৈতিক ধারণার আলোকে মুসলমানদের মাঝে জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণা ও স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক চেতনার দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নে ব্রতী হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদী বা বিপ্লবী আইডিয়া তাদের ছিল না। ইসলামী পুনঃজাগরণ কামনা করেছেন তাঁরা আবেগ উদ্দীপনায় এবং মুসলিম কবি ও বুদ্ধিজীবীদের মাঝেও একই মানস চেতনার পরিচয় ফুটে উঠেছে। আর এসকল কবি সাহিত্যিকগণ ইকবালের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার অনুসারী ছিলেন। তবে এই ক্ষেত্রে নজরুল মুসলিম জাগরণের অভিসারী হলেও ইসলামী জাগরণের ক্ষেত্রে ততটা স্পষ্টবাদী নন।

তিনি মুসলিম জাগরণে পুঁথি সাহিত্যের ধারাকে উপজীব্য করেছেন মাত্র ভাষার পার্থক্যের কারণে বাঙালি কবিদের মধ্যে নজরুলের প্রভাবের মত প্রভাব শেষাবধি রেনেসাঁর কবিগণ আঁকতে ব্যর্থ হয়েছেন। নজরুলের প্রভাব মূলত পুঁথি ও ইসলামী

ঐতিহ্যের সমন্বয় করে আশ্রয় লাভ করেছিলো বলে তার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে অনিবার্য হয়ে পড়ে। নজরুল যখন বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর সামনে তখন কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিকনির্দেশনা ছিলো না, ফলে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ও নিজস্ব আবেগ-অনুভূতি থেকে তিনি সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। অধিকন্তু তিনি একটি বিশেষ সমকালীন প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক জাগরণের স্রোতধারাকে জাতীয় জাগরণ কামনা করেছেন। ফলে হিন্দু মুসলিম মিলন যেমন তার কামনা ছিল, তেমনি সামগ্রিক জাগৃতির কাজেও তাকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল।

এ ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উত্তরাধিকারকে রূপায়ন ঘটাতে তাঁকে ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। তিনি কখনোই একদেশ-দর্শী একটি বেদবুদ্ধি সম্পন্ন রাষ্ট্র কাঠামো চিন্তা ভাবনা করতে পারেননি। যে ক্ষেত্রে বাংলার উনিশ শতকে মুসলিম সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেন পরবর্তীকালে মো. মোজাম্মেল হক, কবি কায়কোবাদ ও সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহিত্যে ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্যকে অপরিমেয় প্রয়োগ করেছেন; তেমনি বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীন চন্দ্র সেন, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ কবিগণ হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র চেতনার বিকাশ কামনা করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে সোনার ভারত পুড়ে ছাই করেছেন। যাঁদের কু কৌশলের কাছে কবি রবীন্দ্রনাথও নিজেকে বিসর্জন দান করেন। এ ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের বিরুদ্ধে আজীবন ছিলেন সোচ্চার-প্রতিবাদী। তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। তাই ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ২ এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় রাজ রাজেশ্বরী মিছিলকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এতে "হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট" বাতিল হয়ে গেলে নজরুল উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এই দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে নজরুল উল্লেখযোগ্য কবিতা গান রচনা করেন। তার মধ্যেঃ হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ, পথের দিশা এবং যা শত্রু পরে পরে অন্যতম। তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ দুটি হিন্দু-মুসলমান ও মন্দির-মসজিদ। কবি সমালোচক আব্দুল কাদির বলেন,'২৬ আগস্ট ১৯২৬ হিন্দু মুসলমান ও মন্দির-মসজিদ প্রবন্ধ দুটি গণবানীতে ছাপা হয়। হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ কবিতায় দাঙ্গার চিত্র দেখা যায়।

"মাভৈঃ! মাভৈঃ এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ সজিব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান।
ছিল যারা- মরণ- আহত,
উঠিয়াছে জাগি ব্যথা জাগ্রত,
'খালেদ' আবার ধরিয়াছে অসি, 'অর্জুন' ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান।
মরিছে হিন্দু, মরে মুসলিম, এ উহার ঘারে আজ
বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা এ মরণে নাহি লাজ।
(হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ)"

শুধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিত্র নয়; তাঁর অসাম্প্রদায়িকতার মানবিকতার উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থে, যা অনন্য মহিমায় ভাস্বরঃ তাঁর রেনেসাঁস ধর্মে, সামাজিকতায়, সাম্যবাদে।

"গাহি সাম্যের গান –
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাঁধা ব্যবধান।
যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রীষ্টান।" (সাম্যবাদী)

নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা যেমন তাঁর কবিতা গানে বিদৃত রয়েছে, তেমনি তাঁর রাজনীতিতে রয়েছে এক উদার মানবিক সাম্যবাদী সমাজ বা রাষ্ট্র কাঠামোর চেতনা। সেখানে নজরুলকে এক সাম্যবাদী রাষ্ট্র চিন্তক রূপে দেখা যায়। তাঁর এই সাম্যবাদী রাষ্ট্র পরিকল্পনার কথা বলতেই তিনি লাঙ্গল পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বলেনঃ "নারী পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা-সূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য। আধুনিক কলকারখানা, খনি ও রেলওয়ে টেলিগ্রাফ ট্রামওয়ে, স্টিমার প্রভৃতি জনগণের হিতকর জিনিস লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মীগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তি রূপে পরিচালিত হইবে। ভূমির চরম মহত্ব লাভ পূরণক্ষম স্বায়ত্তশাসন বিশিষ্ট পল্লী তন্ত্রের উপর বর্তিবে। এই পল্লীতন্ত্র ভদ্র-শূদ্র সকল শ্রেণির শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।" অন্যদিকে কবি রুদ্র মঙ্গল নামক প্রবন্ধে হৈমন্তি অবহেলিত সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণিকে জাগ্রত করতে বলিষ্ঠ বাক্যে ভাবের অবতারণা করেনঃ

"হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক আমার মুটে মজুর ভাইরা! তোমার হাতের লাঙ্গল আজ বলরাম স্কন্ধে হালের মত ক্ষিপ্ত তেজে গগণের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক– এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপরে ধনুক উলটে ফেলুক। আন তোমার হাতুড়ি, ভাঙ্গ ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ। ধুলায় লুটাক অর্থপিশাচ বল দর্পির শির। ছোঁড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙ্গল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্ত মাখা লালে লাল ঝান্ডা। যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাঁদের তোমরা পায়ের তলায় আন। সকল অহংকার তাদের চোখের জলে ডুবাও।" ইত্যাদি। (২৫ সেপ্টেম্বর-১৯২৫)

মূলত নজরুল তাঁর কবিতা গান, প্রবন্ধে, অভিভাষণে রাজনৈতিক মতাদর্শ তুলে ধরেছেন। সমাজের অবহেলিত নিপীড়িত ও সর্বহারাদের জন্য নজরুলের ভালবাসা, সমাজের নীচুস্তরের শ্রমিক, কৃষক, জেলে, তাতি, মজুর প্রমুখ শ্রেণির মেহনতি মানুষকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল। আর তাঁদের দাবী অধিকার সম্পর্কে সচেতন করাই তার সাহিত্য সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ছিল। এ লক্ষ্যে নজরুল কৃষকের গান, শ্রমিকের গান শীর্ষক কবিতা গান রচনা করেছেন। সমাজ পরিবর্তনে নজরুল সাম্যবাদী, সর্বহারা, ভাঙার গান, ফণিমনসা কাব্য গ্রন্থের অসংখ্য কবিতায়, সমাজবাদের আদর্শ প্রচার করেছেন। এমনকি তার মৃত্যুক্ষুধা-উপন্যাসের আনসার চরিত্র সমাজবাদের

আদর্শের আলোকে উজ্জীবিত। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফ বলেন, "নজরুলের সাম্যবাদী, সর্বহারা ও ফণিমনসার কবিতাগুলোও এ আদর্শের অঙ্গীকারে অনুগত।"
নজরুলের রাজনৈতিক যেমন তার সকল সাহিত্য কর্মে কবিতা গান প্রবন্ধে কবিতায়, তেমনি প্রত্যক্ষ পরোক্ষ রাজনীতিতে প্রতিভাত হয়েছে; তিনি যে স্পষ্টতই মার্কসের সমাজবাদের আদর্শের প্রবক্তা তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর রাজনীতি যে স্পষ্ট শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য যার পরিচয় তাঁর কুলি মজুর কবিতায় রয়েছে:

"আসিতেছে শুভ দিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।
তুমি শুয়ে র'বে তেতালার পরে, আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে।
সিক্ত যাদের সারা দেহ মন মাটির মমতা রসে
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বসে।"

এ কবিতা সম্পর্কে কমরেড মুজাফফর আহমদ বলেন,"সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো একেবারে মার্কসবাদ পরিশূন্য নয়। সমাজে যে শ্রেণি সংগ্রাম আছে, তা এই কবিতায় ধরা পড়েছে এবং শ্রেণি সংগ্রামের পরিণতি যে শ্রমিক-মজুর শ্রেণির নেতৃত্বে ক্ষমতা অধিকার এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে, তাতে স্বীকৃত হয়েছে– এ কবিতায়।" (কুলি মজুর-সাম্যবাদী)
আবার নতুন সমাজ নির্মাণেও তার বিপ্লবী চেতনার মানস রূপে ধরা পড়েছে, যেখানে নজরুল ঘুনে ধরা ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ নির্মাণের স্বপ্নে বিভোর। কবি বলেন,

"ঐ নতুনের কেতন উড়ে কাল বৈশাখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নতুন সৃজন বেদন।
আসছে নতুন জীবন হারা অসুন্দরের করতে ছেদন।
এই সে এমন কেশে বেশ
প্রলয় বয়ে আসছে হেসে,–
ভেঙ্গে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয় ধ্বনি কর।" (প্রলয়োল্লাস)

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল কবি কুমিল্লায় বসে তার বিখ্যাত কবিতা প্রলয়োল্লাস রচনা করেন। এ কবিতায় রাজনীতি, দর্শন, সমাজবাদ, উল্লাস সবই আছে। আছে সমাজ দ্রোহের এক অশনি সংকেত–অসহযোগ, খেলাফত ও স্বাধীনতা আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি এ কবিতা রচনা করে দেশবাসীর জাগরণ ঘটাতে প্রয়াস পান। এ কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনের প্রেরণার এক অনন্য উৎস। এ কবিতার স্পিরিট সম্পর্কে কমরেড মুজাফফর আহমদ বলেন, "১৯২১ সালের শেষাশেষিতে আমরা এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলব স্থির করেছিলাম। কাজী নজরুল ইসলামও আমাদের এ পরিকল্পনায় ছিল। আমাদের এ পরিকল্পনা হতেই সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর সুবিখ্যাত প্রলয়োল্লাস কবিতা। তাঁর সিন্ধু পাড়ের আগাল ভাঙ্গা মানে রুশ বিপ্লব। তাঁর প্রলয় মানে বিপ্লব। আর জগৎ জোড়া বিপ্লবের ভিতর দিয়েই আসছে নজরুলের নতুন অর্থাৎ আমাদের দেশের বিপ্লব। এই বিপ্লব আবার সামাজিক বিপ্লব। এতো স্পষ্ট রাজনীতি। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিদ্রোহী, প্রলয়োল্লাস, ভাঙ্গার গান, কুলিমজুর, সর্বহতারা, পুবের হাওয়া, আমার কৈফিয়ত সাম্রাজ্যবাদীর কবিতাগুলো সেই প্রকৃতিতে নজরুলের দেশাত্ববোধ, গণমানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ধরা পড়েছে। নিপীড়িত সর্বহারা মানুষের সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে তার পুরাতন জরাজীর্ণ সমাজ ভেঙ্গে গড়ার প্রত্যয় করেছেন; যা তাঁর গণসাহিত্যগুলোতে ভাস্বর হয়ে আছে। তিনিই প্রথম বাংলা কবিতায় মার্কসবাদের আলোকে নতুন রাষ্ট্র কাঠামো নির্মাণের কথা স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছেন। পুঁজিবাদের দৃষ্টক্ষত আমাদের অসহায় দরিদ্র সর্বহারা মানুষকে আরো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে, অনড় স্থবির করে রাখে।

তাঁর সাথে সহযোগিতা করে সামন্তবাদ। এদেশের সামন্তবাদ এর সাথে যোগ দিয়েছিল বৃটিশ সামরাজ্যবাদ- সুদখোর মহাজন শ্রেণি। এরাই এদেশের কোটি কোটি কৃষক শ্রমিক মুটে মজুর তাঁতী জেলেদের ঋণের জালে ফাঁসিয়ে তাদের জমিজমা বাড়ি ঘর সহায় সম্বল কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব রিক্ত সর্বহারায় পরিণত করেছিল। যুগে যুগে এই সামান্তবাদী পুজিবাদী শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে। কিন্তু তাঁরা এতই শক্তিশালী যে তাঁদের সাথে বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণি তাদের এদেশীয় দালাল মুৎসুদ্দী, সুদখোর মহাজন, ধর্মান্ধ গোষ্ঠীতা যোগ দেয়। ফলে তারা অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। সমাজের অভিজাত শ্রেণিও তাঁদের সমর্থন করে। মুসলমান সমাজে এই সামন্ত প্রভুদের পরিচয় খান বাহাদুর আবার হিন্দু সমাজে এই সামন্ত প্রভূদের পরিচয় রায়বাহাদুর বলে খ্যাত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী তাদের তাঁবেদার দালাল শ্রেণির ভূস্বামীদের এমনি খেতাবে ভূষিত করেছেন। নজরুল ছিলেন আমাদের সমাজের নিপীড়িত সর্বহারা মানুষের আদর্শিক পুরুষ ও মুক্তির প্রেরণাদাতা এক অনন্য সাহিত্য স্রষ্টা। তাই সাহিত্য সৃষ্টির মাঝেও তিনি নিপীড়িত শোষিত মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেন। গণমানুষের মানস জাগরণে রেনেসাঁর সৃষ্টি করেন। কি কবিতা, কি গান, কি প্রবন্ধ, কি উপন্যাস।

আবার তাঁর রাজনৈতিক ও সাংবাদিক জীবনে এই সমাজ পরিবর্তনের কথা তিনি কম লেখেননি। তাঁর সামন্তবাদ ও পুজিবাদ বিরোধী চেতনার বহিঃপ্রকাশ, তাঁর কবিতা-গান ও প্রবন্ধের বহু জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। নজরুল তাঁর গান কবিতায় যে সমাজবাদের আদর্শ প্রচার করেছেন; মূলত রাজনীতিতেও তিনি সেই আদর্শ বাস্তবায়নে কাজ করেছেন। সমাজের অবহেলিত নিপীড়িত সর্বহারা মানুষের মুক্তি

আদায়ে, তাঁদের মানস জাগরণে তিনি রাজনৈতিক সাহিত্য বা গণসাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর শ্রমিকের গান কবিতায় সচিত্র প্রমাণ রয়েছে।

"ওরে ধ্বংসপথের যাত্রীদল
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই
পায়ের সুখে ভাঙব চল
ধর হাতুড়ি তোল কাধে শাবল।" (শ্রমিকের গান)

আবার কৃষক শ্রেণির জন্য তাঁর গানে একই চিত্র পাওয়া যায়।

"ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙ্গল।"

"মোদের উঠান ভরা শস্য ছিল হাস্য ভরা দেশ
ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ।" (কৃষানেণ গান)

আবার গণমানুষের মুক্তির জন্য, শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত সর্বহারা মানুষের মুক্তির জন্য তিনি লিখলেন।

"জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্য হত
যত অত্যাচারের আজি বজ্রহানি।
হাঁকে নিপীড়িত জনমন মথিত বাণী
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত।"

তাঁর কুলিমজুর কবিতায় শোষিত নিপীড়িত সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির সুর বারবার ধ্বনিত হয়েছে। নজরুলের অবস্থান স্পষ্ট শোষকের শ্রেণির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, আর অন্যদিকে তাঁর গণসাহিত্য রচনার মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষী গণমানুষ তথা সমগ্র ভারত জুড়ে এক মানস বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হন। প্রভুদের সম্পর্কে বলেন: "চাষী সমস্ত বছর ধরিয়া হাড় ভাঙ্গা মেহনত করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দুবেলা পেট ভরিয়া মাড় ভাত খাইতে পারে না, হাঁটুর উপর পর্যন্ত তেনা বা নেংটি ছাড়া তাহার আর ভালো কাপড় পিরান পরা যাদের জীবনেও ঘটিয়া উঠে না। ছেলে মেয়ের স্বাদ-আরাম মিটাইতে পায় না, অথচ তাহারাই ধান চাল লইয়া মহাজনেরা পায়ের উপর পা দিয়া বার মাসে ত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবী চালে দিন কাটাইয়া দেন। কয়লার খনির কুলিদিগকে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি তাহাদের কেহ ত্রিশ চল্লিশ বছরের বেশি বাঁচে না; তাহারা দিন রাত্রি খনির নীচে পাতালপুরীতে আলোবাতাস হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া, কয়লার গাদায় কেরোসিনের ধোঁয়ার মধ্যে কাজ করিয়া শরীর মাটি করিয়া ফেলে। কোম্পানি তো তাদের দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছে।" শোষিত মেহনতি সর্বহারা মানুষের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ ও দরদ কতটা তা মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে ও ধর্মঘট প্রবন্ধদ্বয়ে চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বাঙালির সামাজিক রেনেসাঁয় নজরুল

নজরুল বিশেষজ্ঞ নারায়ণ চৌধুরী বলেন: "নজরুলের মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে এবং ধর্মঘট শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে নিঃসন্দেহে রুশ বিপ্লবের অস্পষ্ট হলেও প্রণোদনা ছিল।" তাঁর পুঁজিবাদ বিরোধী চেতনার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ভাষণ বক্তৃতা ও অভিভাষণে। ৫ ও ৬ এপ্রিল ১৯৪১ কলিকাতা মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জুবিলি উৎসবে নজরুল সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন: "হিন্দু-মুসলমান দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধবিগ্রহ, মানুষের জীবনের একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তুপের মতো জমা হয়ে আছে। এই অসাম্য ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম আমাকে কেবল মুসলমান বলে দেখবেন না, যদি আসি, আসবো হিন্দু মুসলমান সকল জাতির ঊর্ধ্বে যিনি একমেবেদ্বিতীয়াম তারই দাস হয়ে।"

নজরুলের এই অভিভাষণটি, "যদি আর বাঁশি না বাজে"– শিরোনামে সর্বত্র প্রচার ও পরিচিতি লাভ করেছে।

বস্তুত নজরুলের রাজনৈতিক জীবনের কিছু তথ্য পাওয়া যায় কুমিল্লাতে। ১৭ নভেম্বর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলাস ভারতের বোম্বেতে আগমন উপলক্ষ্যে সারা ভারতে হরতাল ডাকা হয়েছিল। কুমিল্লাতেও হরতাল ডেকেছিল কংগ্রেসসহ বিভিন্ন সংগঠন। এ সময় নজরুল কুমিল্লাতেই ছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি জাতীয়তাবাদী ধারার দেশাত্ববোধক গান লেখার অনুরোধ আসে। আশ্চর্য এই যে, নজরুল জাগরণী শীর্ষক একটি রচনাই শুধু করলেন না, গলায় হারমোনিয়াম বেঁধে তিনি সমস্ত কুমিল্লা শহর মিছিলের অগ্রভাগে থেকে সে গান গাইলেন।

গানের কথা :

"ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!
ফিরে চাও ওগো পুরোবাসী
সন্তানদ্বারে উপবাসী,
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও
কার তরে জ্বাল উৎসব দীপ
দীপ নেবাও দীপ নেবাও
মঙ্গলঘট ভেঙ্গে ফেলো
সব গেল মা গো সব গেল।"

মিছিলে গান গাইবার সময় নজরুল তোরাব আলী শহর দারগা কর্তৃক মোগলটুলি রাজগঞ্জ থানা মোড়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অবশ্য ২৪ ঘণ্টার পূর্বেই তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। বলা দরকার যে, গান গেয়ে মিছিল করার সময় কুমিল্লার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ছাড়াও শ্রী শৈলেশ চন্দ্র সেন, উমেশ চক্রবর্তী, হেমেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ। আরো ছিলেন কংগ্রেস নেতা বসন্ত কুমার মজুমদার ও তার দুই মেয়ে শান্তি মজুমদার ও অরুণা মজুমদার। কুমিল্লার রাজনৈতিক মিছিলে এই প্রথম কোন মেয়ে মানুষের যোগদান। কবি নজরুলের জন্যই এটি সম্ভব হয়েছিল। কারণ তিনি কুমিল্লায় সকলের কবিদা হয়ে উঠেছিলেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবুল ফজল বলেন: "শুধু কি প্রেমের, কবির রাজনৈতিক জীবনেরও শুরু কুমিল্লাতে। সে যুগে গলায় হারমোনিয়াম বেঁধে উদাত্ত কণ্ঠে স্বরচিত গান গেয়ে মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। কবি জাগিয়ে তুলেছেন সারা কুমিল্লার পুরবাসীকে"। ১৯২২ এর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেই কবি রচনা করেন তার সুবিখ্যাত কবিতা বিদ্রোহী, যা ৬ জুন ১৯২২ ছাপা হয় প্রথম সাপ্তাহিক বিজলীতে। বিদ্রোহী প্রকাশিত হবার পর নজরুলের কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বাংলায় এবং তার জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কবি সমালোচক আবুহেনা মোস্তফা কামাল বলেন: "সমগ্র বাংলা কবিতার ইতিহাসে এই বিদ্রোহীর উপলব্ধি ও ঘোষণা অভিনব। এতে সমাজ ভাঙ্গার রাজনীতি আছে। সমাজের অন্যায় অবিচারের নির্জিবতা ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে দ্রোহ আছে।" নজরুলের এই দ্রোহ, সমাজ ভাঙ্গার, শাসন ভাঙ্গার, শোষণ ভাঙ্গার, নতুন সমাজ নির্মাণের, যে সমাজ আগামীর, আগামী প্রজন্মের, যে সমাজে শিশুর গুণে সামন্তবাদীর গেলাসের রঙ্গিন পানীয় হবে না, ক্ষুধার্ত শিশু দুবেলা দুমুঠো অন্ন পাবে। কবি বলেন,

"ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ
চায় একটু নুন, একটু ভাত।" (দারিদ্র্য)

২২-২৩ তারিখ ১৯২৬ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন কংগ্রেস দায়িত্ব দিয়েছিল নজরুলকে উদ্বোধনী সঙ্গীত রচনার। নজরুল উদ্বোধনী সঙ্গীত রচনা করলেন: কান্ডারী হুঁশিয়ার–এক উৎকৃষ্ট কোরাস সঙ্গীত, যার তুলনা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে নেই। "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রী নিশিতে যাত্রীরা হুশিয়ার।"

নজরুলের এ বিখ্যাত গান সম্পর্কে বিপ্লবী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বলেন:

"আমরা যখন যুদ্ধে যাব সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব তখনও তাঁর গান গাইব। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই; বিভিন্ন প্রদেশের ভাষার জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের দুর্গম গিরি কান্তার মরুর মত প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না। কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়, সমগ্র বাঙালি অবিভক্ত বাংলার কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিপীড়িত শোষিত

সর্বহারা কৃষক শ্রমিক মুটে মজুর ভাগ্যহত গণমানুষকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। আর এ কারণেই তার সাহিত্য কর্ম– গণসাহিত্যের আওতাভূক্ত। যেহেতু তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্ম মানব জীবনের মুক্তি কামনা ও বৃহৎ সমাজ জাগরণের হাতিয়ার, সেই অর্থে বাঙালির রেনেসাঁসে নজরুল এ কথা বলেই বিশ্বাস।

শেষ কথা : কাজী নজরুল ইসলাম সমগ্র বাঙালি জাতিসত্তার কবি। বাঙালির চিন্তা চেতনা মননে তিনি যে বিপ্লব এনেছিলেন তা শুধু তাত্ত্বিক জাগরণে নয়; সামগ্রিক চেতনায় ছড়িয়ে আছে। তিনি বাংলা কবিতায় প্রথম মানব মুক্তি ও সাম্যবাদের সুর এনেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে মৈত্রীর বাণী বাহক হিসেবে,– প্রেমেদ্রোহে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এ যাবত প্রচলিত বাঙালির মূল্যবোধের বদল ঘটিয়ে তার জায়গায় অতি সাধারণ মানুষের জয়গান করেছিলেন। দীর্ঘকালের নিপীড়িত শোষিত বঞ্চিত কৃষক শ্রমিক অগণিত মানুষের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তাঁর কলমের মুখে ভাষা জুগিয়েছিলেন। সমাজের গণমানুষের মনো বিপ্লবের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় রেনেসাঁস আর কি হতে পারে। তাঁর তুলনা সমসাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল; কারণ তিনি রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে নতুন যুগের হাওয়া সবেগে বইয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বাঙালির রেনেসাঁয় নজরুল

নজরুল রেনেসাঁস ঘটিয়েছিলেন বাঙালির সমাজ জীবন থেকে পারিবারিক জীবনের চিন্তা চেতনা মননের সর্বত্র। তাঁর রেনেসাঁস একেবারে দেশীয় খাঁটি-বিদেশ থেকে ধার করা নয়। যদিও রেনেসাঁস কথাটি ইউরোপের ইতিহাস থেকে নেওয়া হয়েছে। রেনেসাঁস কথাটার শব্দগত অর্থ পুনর্জন্ম বা পুরাতনে ফিরে যাওয়া বা পুরাতনকে নতুন করে ফিরে পাওয়া। যদিও তাঁর ভাবগত অর্থ নবজন্ম। বুদ্ধি-কল্পনার সাথে মানব মহিমা পুন প্রতিষ্ঠাকরণ। এক অর্থে জীবন সূর্যের পুনরায় বুদ্ধি কল্পনার জয়যাত্রার ইতিহাস।

অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন ক্ষয়িষ্ণু সমাজে মানবাত্মা মহৎ করতে না পেরে অবশেষে পরিণামে বিক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। যখন মানব জীবন, জগৎ– সংসার, তার প্রেম সৌন্দর্য হারিয়ে সর্বহারা হয়ে যায়। তখন কে আবার তা ফিরে পেতে চায়। জীবনের গান নতুন জীবন বোধ তাঁকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। নতুন করে মানবের এই চিন্তা ও কল্পনার অনুশীলন, মূলত জীবনেরই অনুশীলন। তখন মানব সত্তা নতুন করে, নতুন প্রভাতের জয়গান গাইতে থাকে, সৃষ্টি করে নব আনন্দে। নজরুল সাহিত্যে জীবন প্রীতির এই উন্মাদনা দেহ কেন্দ্রিক, শিল্প কেন্দ্রিক; যার প্রভাব গ্রিক জ্ঞান চর্চার, আবার পারস্য সাহিত্যের প্রভাবও রয়েছে। বিশেষ করে মহা কবি ওমর খৈয়ামের যে জীবন বাণী, দর্শন তার একটা প্রভাব তো নজরুলে আছেই। পুরাতনে ফিরে যাওয়া নয়; বরং জীবন প্রীতি বুদ্ধির মুক্তি – কল্পনার মুক্তি ও অনুভূতি প্রীতিই রেনেসাঁয়। ওয়ালটার পীটার বলেন: "রেনেসাঁস কথাটার আজকাল কেবল পঞ্চদশ শতকের প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য প্রীতি না বুঝিয়ে এমন এক জটিল আন্দোলন বুঝায় স্বীয় জ্ঞান প্রীতি যার একটা দিক বা লক্ষণ মাত্র। তার মতে রেনেসাঁসে যুগ বুদ্ধি ও কল্পনার প্রতি আগ্রহশীল এক উদার জীবনের যুগ। কি নতুন, কি পুরাতন, বুদ্ধি ও কল্পনার খোঁজে এ যুগ চঞ্চল।" আর এই যুক্তিবাদী জ্ঞান ও কল্পনার উদার জমিনই নজরুল সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত ধ্যান-ধারণার নীতি বিরোধী চেতনা রেনেসাঁসের এক বিশেষ লক্ষণ। বুদ্ধির মুক্তি ও হৃদয় দিয়ে অনুভব করে যে ধর্ম নামের জগদ্দল পাথর রেনেসাঁসের আলোকবাহীগণ অতিক্রম করতে লাগলেন জীবন প্রীতির ফলে। অন্ধভাবে মানা নয়; জানা বোঝা তার পরে জয় করতে হবে। Man is the measure of everything তাই দেখা যায় শাস্ত্রের চেয়ে হৃদয় মনকে বড় স্থান দেয়া হয়েছে রেনেসাঁসের যুগে। দিনকে তার ইয়ে বড় বেতার, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হক তার রেনেসাঁস এই ঘোষণা করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। নজরুল তাঁর কাব্যে সেটি স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছেন:

"মিথ্যে শুনিনি ভাই, হৃদয়েরে চেয়ে
বড় কোন মন্দির কাবা নাই।"

মানব মহিমা বর্ণনা করেছেন আরেক কবি অক্ষয় কুমার বড়াল তাঁর মানব বন্দনা কবিতায়। এই মাটি, গাছ, পাথর, পাহাড়, নদী নালাকে ঘর বাড়ি ইমারতকে যে মানুষ সুন্দর সাজানো বাগানের মত করে সাজিয়েছে, সেই সৌন্দর্যের নির্মাতা কারিগর সেই মানুষই সকল নান্দনিকতার উৎস এখানে কোন স্রষ্টাবাদে দেবী তাঁর কাছে গৌন। তাই তিনি মানব বন্দনা করেছেন। কখনো ঝড় বৃষ্টি জলোচ্ছ্বাসের দেশে চির বসন্তের আমেজ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন অমিতবিক্রম তেজে কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর আগমনে রেনেসাঁসের স্রোতধারা বইতে থাকলে, বুদ্ধির মুক্তি, অনুভূতির প্রকাশ, কল্পনার স্বর্গ দ্বার খুলে মানব মহিমা ঘোষিত হলো। তাঁর সাম্যবাদী কাব্য গ্রন্থের সকল কবিতাই প্রায় মানুষের জয়গানে মুখরিত। আর অগ্নিবীণার সকল কবিতায় মানুষের মুক্তির জন্য বিক্ষোভ, বিক্ষোভের পর বিদ্রোহ ঘোষণা:

"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান
এই দেশকাল পাত্রের ভেদ অভেদ্য ধর্ম জাতি
সব দেশে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।" (মানুষ, সাম্যবাদী)

শৃঙ্খলিত মানব আত্মা নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় যেন মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছে। গণমানুষের সকল দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তির প্রয়াসে বিদ্রোহী এক চিরন্তন মুক্তির প্রেরণা। আর মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবে প্রেরণা আকাঙ্ক্ষা নজরুল কাব্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু উপদেশ নয়; জীবনে মুক্তির যে সার্বজনীন বোধ চৈতন্য, তা আবেগে প্রাবল্যে উচ্ছ্বাসে অনুভূতিতে নজরুলই বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রকাশ করলেন। জীবন প্রবাহে প্রতিকূল আবহাওয়াকে মেনে নিতে চাননি বলেই, কঠিন সাইক্লোনের স্রোতেও থেকেছেন অনড় অটল। বিরোধী সত্তা নিয়ে প্রচলিত যে সনাতন মিথ্যা-ভণ্ডামী তিনি তার বিরোধিতা করেছেন আর এই বিরোধিতাই রেনেসাঁসের বড় লক্ষণ। যা নজরুল জীবন ও কাব্য সাহিত্যে অনন্য মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আবেলার্ত, পিকো প্রভৃতি লেখকগণ যে বিরোধিতার ভেতর দিয়ে আত্মার ও মননের ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছিলেন, তা নজরুলেও বর্তমান। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যে সার্থক সমন্বয় প্রয়াস, তা নজরুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নজরুল প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী না হয়ে বরং হয়েছিলেন জীবনবোধে আধুনিক মুক্ত জীবনের বাণী বাহক "মুক্ত স্বাধীন বন্ধন ও হীন চিত্ত মুক্তি শত দল।"

"মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম,
মোরা ঝরণার মত চঞ্চল।
মোরা বিধাতার মত নির্ভয়,
মোরা প্রকৃতির মত স্বচ্ছল।"

হিন্দু-মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে বিভিন্ন রূপক-প্রতীক ব্যবহার করেছেন। সেসব কবিতায় ভাব ভাষা ছন্দ প্রয়োগে তিনি স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তিনিই প্রথম নির্ভীক চিত্তে কবিতায় হিন্দু দেবদেবীর নাম ব্যবহার করে যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও দেখাতে পারেননি। এখানে তাঁর চিত্তের বিত্তশালিতার ও মহত্ত্বের পরিচয় সুস্পষ্ট। এই ধর্ম চিন্তায় ও মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা, হিন্দু ঐতিহ্য মীথের যে ব্যবহার যে প্রয়াস তাঁর কাব্যে যা দেখে হিন্দু লেখকগণ বিস্মিত হয়েছেন। যদিও রেনেসাঁসের কোন কোন লেখক এতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন। কিন্তু নজরুল রেনেসাঁস দলের সেই লেখক, যিনি চিন্তার মুক্তিতে শুধু কথায় নয় বরং লেখনীর মাধ্যমে তা প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মুসলিম ইতিহাস- ঐতিহ্য নিয়ে একটি কবিতা গান লিখলেন না; অথচ নজরুল হিন্দুর ইতিহাস ঐতিহ্য মীথ নিয়ে অসংখ্য কবিতা গান রচনা করেছেন, এতে রেনেসাঁস পন্থীদের নাকি মাথা নুয়ে পড়ে, মুসলিম জাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। এর কারণ অতি সোজা। হিন্দুর ঐতিহ্য নজরুলের তথা মুসলমানের উত্তরাধিকার রয়েছে; কিন্তু মুসলমানের ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথের তথা হিন্দুর উত্তরাধিকার নেই। কারণ মুসলিমগণের সাথে প্রাণের যোগ নেই। তারা বহিরাগত তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অনুরাগ বশত গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু তারা ভুলে যায় দেশের ঐতিহ্য সাংস্কৃতি একপ্রকার জলবায়ুর মতই সহজ, তাকে বোঝা কঠিন নয়। দিনের আলোর মত সহজ সত্যকে তারা অস্বীকার করেন। যারা দিনের আলোর মত সহজ সত্যকে স্বীকার করতে চান না, শুকিয়ে মরা তাদের ভাগ্যলিপি, হিন্দু মুসলিম ঐতিহ্য সংস্কৃতি দুই ধারাকে মিশ্রণের দায়িত্ব মুসলমানেরই; কারণ, তারা দুই উত্তরাধিকারকেই বহন করছে। হিন্দুর এবং মুসলমানের। দুইই উত্তরাধিকার আইনেও মুসলমান পিতা মাতার সম্পত্তির উভয়েরই ওয়ারিশ। কাজেই মুসলমানের এই দুই উত্তরাধিকার স্বীকার করে তবে, তার দ্বারা মহৎ সৃষ্টি সম্ভব। যে অসম্ভবকেই রূপদান করেছিলেন নজরুল ইসলাম। প্রতিভার প্রকৃত রূপ দিতে এই দুই সংস্কৃতির এক যুগল বন্দী বা সমন্বয়রূপ দিয়ে এক নব সাংস্কৃতিক ধারা সৃষ্টি করেছিলেন নজরুল। সুস্পষ্ট তার এই সাধনা অমিত বিক্রম তেজস্বী তার প্রাণশক্তি। যার বদৌলতে তিনি তাঁর কাণ্ডারী হুঁশিয়ার কবিতায় বলতে পেরেছিলেন:

"হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন!
কাণ্ডারী বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।" (কাণ্ডারী হুশিয়ার)

নজরুলের গ্রহণ, হিন্দুর ভারতীয় মীথ, স্বজাতির তো রয়েছেই, গ্রহণতা উপভোগ-অপার সৃষ্টির বিস্ময় আনন্দ। আর আনন্দ ব্যতিত সুখ ব্যতিত কোন মহৎ কাজই সম্পাদন হয়ে উঠে না। মুসলিম জাতি বহিরাগত, তারা বিজয়ী, তারা ভালবাসা দিয়ে ভারতের সমগ্র জাতি গোষ্ঠীকে গ্রহণ করেছেন, আর গ্রহণ করেছেন ভারতের ভাবভাষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে–ফলে এক মেল বন্ধনের সূত্র তৈরী হয়েছে। আর নজরুলে তা এক যৌথ সাংস্কৃতিক সত্তা নিয়ে নব ধারায় আবিষ্কৃত হয়েছে। হিন্দু ধর্ম আনন্দঘন ও উৎসবময় ছোয়াচে। হিন্দুর নানা উৎসবে-পার্বণে ক্রমে যেমন-যাত্রাপালা, পাচাঁলী, কবিগান প্রভৃতি মুসলমানগণ যোগ দিয়ে বেমালুম হিন্দু ঐতিহ্যের অনেকে জেনেছে ও পেয়েছে। আর আট কালচারের ব্যাপারটাই তাই সাধারণ্যে প্রবেশের ফলে, তা মুসলমানের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। সাহিত্য তথা কালচার হয়ে তা আনন্দের ধারা বেয়ে আমাদের হৃদয় দুয়ারে আঘাত করেছে আর মুসলমানগণ তা বেদরদীর মত দ্বার রুদ্ধ করে বসে থাকতে পারেনি। আর গ্রহণের

রেনেসাঁসে নজরুল তাঁর সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগ করে বাংলা সাহিত্যে বিপ্লব সাধন করলেন।

নজরুলের রেনেসাঁসের প্রেরণা মূলত বুদ্ধির ও হৃদয়ের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা; যা তিনি অনুভব করেছেন, দেশের সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক মুক্তির নিরিখে, যুগযুগ ধরে সঞ্চিত ধর্মনামের অন্ধত্ব গোঁড়ামীর জগদ্দল পাথর চাপার সহজ সরল মানুষের বিশ্বাস নিয়ে সর্বহারা গণমানুষের অত্যাচার নিপীড়ন থেকে মুক্তির আকুতি তার কবিতা গান ও সাহিত্যের উপজীব্য ও মৌল প্রেরণা। শুধু তাই নয়, তিনি বাঙালির সমাজিক জীবনের সর্বত্র আমাদের চিন্তা চেতনা মননে, আনন্দ উচ্ছ্বাসে প্রেমেদ্রোহে অতন্দ্র প্রহরীর চৈতন্যে ব্যক্তি থেকে সমষ্টি; সমষ্টি থেকে রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালির জাতিসত্তা নির্মাণের এক অনন্য কারিগর হয়ে আছেন। রেনেসাঁস মূল্যবোধ ও যুক্তি বিচারের এই স্বাধীনতার একটি অহংবোধ অপরটি সাধারণ মানব প্রীতি। নজরুল ছিলেন সাধারণের পক্ষে তাই তিনি মনুষ্যত্বের জয়গানে মুখর, বিভেদের প্রাচীর ভাঙ্গার পক্ষে তিনি। কারণ সকল কালের সকল মানুষের কবি সাহিত্য স্রষ্টা তিনি। সাধারণ সকল মানুষ যেন তাঁর এই সকলের হয়ে উঠার সত্যটিকে অনুভব করেন। তবেই বাঙালির রেনেসাঁসে নজরুল এ কথাটি সার্থকতা লাভ করবে।

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ:

১. উদাসী বাউল (কাব্যগ্রন্থ-২০১৮)
২. নজরুল সাহিত্য সমাচার (প্রবন্ধগ্রন্থ-২০১৮)
৩. নজরুল সঙ্গীতের কালপ্রেক্ষিত (প্রবন্ধগ্রন্থ-২০১৯)
৪. অনন্য মওলানা ভাসানী (প্রবন্ধগ্রন্থ-২০২১)
৫. মহাকালের কবি নজরুল (প্রবন্ধগ্রন্থ-২০২২)
৬. বাঙালির রেনেসাঁয় নজরুল (প্রবন্ধগ্রন্থ-২০২৩)

প্রকাশের পথে যেসকল গ্রন্থ:

১. নজরুল কাব্য বিদ্রোহীঃ একটি নতুন পাঠ
২. নজরুল সাহিত্য পরিক্রমা
৩. নজরুল সাহিত্য বিচার
৪. নন্দিত-নিন্দিত নজরুল
৫. কালবেলা (কলামগ্রন্থ)
৬. কাবার পথে পথিক (ধর্মীয়গ্রন্থ)
৭. হক্কুলার পথে (ধর্মীয়গ্রন্থ)
৮. মহাসত্যের সন্ধানে (ধর্মীয়গ্রন্থ)
৯. ইসলামের রক্তঝরা পথে (ধর্মীয়গ্রন্থ)
১০. পয়গামে মুহাম্মদ (সাঃ) (ধর্মীয়গ্রন্থ)
১১. মুহাম্মদ (সাঃ) সমাজ বিপ্লব (ধর্মীয়গ্রন্থ)